Coffee House
An Undaunted & Uncompromising
Journal for Micro-Literature
& Criticism

শারদীয়া/১৪০৭

কফিহাউস

মগ্ন পাঠকের জন্য

●

বন্দুক থেকে গুলির বদলে ছুটে আসে ফুল
শান্তি এবং সন্ধি
রাইফেল আর বেয়নেট যত
এখন নিয়েছে সন্ন্যাসব্রত
যুদ্ধ এখন ফুলের মালায় হয়েছে বিবেকবন্দী।

এই গালে চড় কিম্বা মারুন
পশ্চাদ্দেশে সজোরে একটা লাথি
প্রতিবাদহীন, প্রতিঘাতহীন জড়তায় দ্যাখো
ক্লীব হয়ে আছি ধৃতরাষ্ট্র
গলিত স্থবির জরদ্গাবের মতন বুড্ঢা হাতি।

●

হৃদয় পুড়ে দগদগে ঘা, দেখতেও তুমি পাও না
না হয় দৃষ্টি অন্ধ তোমার, পোড়া গন্ধ, তাও না ?

●

ভুল নামে ডেকে ফ্যালো বারবার
কতবার সাড়া দেওয়া যায়
করুণা, আমি যেন ওই মৃতদের অনুগামী
ফেলে যাওয়া খই
আমার তো পরশপাথর নেই
শুক্‌নো ডাল, লতা রঙ ক'রে
বৈঠক সাজানো জানা নেই।

●

এই দেখছো গুচ্ছ গুচ্ছ লাল গোলাপ,
কৃষ্ণচূড়া গনগনে আগুন ঝরাচ্ছে
পরক্ষণেই শ্বেতপদ্ম, চন্দ্রমল্লিকা—শান্ত সমাহিত।
তেম্‌নি কবিতারও শীত গ্রীষ্ম আছে।

কবিতাগুলোর রচয়িতার নাম সঠিক বলতে পারলে সর্বপ্রথম উত্তরদাতাকে 'কফিহাউস শ্রেষ্ঠপাঠক পুরস্কার' প্রদান করা হবে।

IPP Limited

(Wholly owned by Govt. of West Bengal)

Manufacturer of Quality Paper

Cream Wove ● White Cover ● Coloured Wove
● Consular Bond ● Azura Laid ● Opaline Printing
● Victory Bond ● Pulp Board

Regd. Office

13A, Biplabi R. B. Behari
Bose Road, (1st Floor),
Calcutta-700 001
Ph 2422619 2595 6502

কোরাস ৮১-র ব্যতিক্রমী নাটক

যাকে হিসাব দিতে হয় না

প্রয়োগ : তড়িৎ চৌধুরী

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে শিশির মঞ্চে

যোগাযোগ : ১৪/২ সদর স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

NEW PATNA TRANSPORT AGENCY

Daily Service

Calcutta, Patna Jn, Patna City, Nawada, Jhumari, Tellaiya, Giridih, Deoghar
Madhupur, Biharsharif, Jamui, Jha Jha, Lakshmisarai

CALCUTA AND HOWRAH OFFICE

- P/222/3, Strand Bank Road
  Calcutta-700 007
  Ph 210 0677
- 67/2B, Strand Road,
  12 Cross Road,
  Calcutta-700 006
  Ph 230-2657
- 3, Peter Lane,
  Calcutta-700 073
  Ph 237-8530

PATNA OFFICE

- Exhibition Road,
  Opposite – Reserve Bank
  Patna – 800 001
  Ph 670124
- Quilla Road
  Patna City
  Ph 64-3615

শারদীয়া ।। ১৪০৭

কফিহাউস

১৪ তম বর্ষ ।। ৩য় সংখ্যা

অণুসাহিত্য ও সমালোচনার আপোসহীন, নির্ভীক পত্রিকা

An undaunted & uncompromising journal for micro-literature & criticism

সম্পাদকীয় কার্যালয়

২৫/বি, নীলমণি মিত্র রো, কলকাতা - ৭০০ ০০২

[আর জি কর হাসপাতালের পাশে]

Voice : 5432566

একালের গল্প

সেরাগল্পের সংকলন। শিগ্রি প্রকাশ হবে। তরুণ গল্প লেখকদের পরীক্ষাধর্মী ছোটগল্প পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন কেবলমাত্র গুণগত ভিত্তিতে। সম্পাদনায় থাকবেন প্রসিদ্ধ ছোটগল্প লেখক।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

অনিন্দ্য দেব
৮৪বি, শ্রী অরবিন্দ সরনি।
কলিকাতা-৭০০ ০০৫

অশোক রায়চৌধুরী
২৫/বি, নীলমনি মিত্র রো,
কলি-৭০০ ০০২

এখনও পাওয়া যাচ্ছে কয়েক কপি। প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত

কবিতার একাল

বিগত ৫০ বছরের আধুনিক বাংলা কবিতার প্রামাণ্য সংকলন।

P-1074

কফিহাউস-এর লেখক-লেখিকাদের প্রতি একটি নম্র নিবেদন

অনুরচনাই চেয়েছিনু ভাই, পেয়েছি তা অতি অল্প,
অণু নয় তারা, অতিকায় যারা—বৃহৎ শব্দকল্প।
বহুরচনাই কেটে ছেঁটে তাই ক্ষুদ্র করেছে কাঁচি
গুণীরা মশাই কর জোড়ে ভাই ক্ষমা-মার্জনা যাচি।

ছোট ক'রে লেখা রপ্ত করুন কফিহাউসের কবি
বিস্মৃতে সব সিন্ধু গড়ুন, হোন কবি অভিনবী।
মৌপাসার গুরু ফ্লবেয়ের বাণী মগজেতে গেঁথে দিন
পেনের প্রয়োগ কমিয়ে দুহাতে ইরেজার তুলে নিন।।

অশোক রায়চৌধুরী
সম্পাদক।। কফিহাউস

লেখক লেখিকারা সৌজন্য-সংখ্যার বদলে ৪০% ডিসকাউন্টে পত্রিকাটি কিনে নিয়ে কফিহাউসকে বাঁচতে সাহায্য করুন এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও। কারণ —
"The hands that help are holier than the lips that Pray."

কবি তরুণ সান্যালের পর কফি হাউস পত্রিকার সাহিত্য সম্মান

"কবিতার মানুষ"—অভিধা

আপাতত যাঁরা পাচ্ছেন ঃ

উৎপল কুমার বসু/মণিভূষণ ভট্টাচার্য/ছবি তরফ/রণজিৎ দাশ/উত্তম দাশ/কালীকৃষ্ণ গুহ/মল্লিকা সেনগুপ্ত/ প্রভাত চৌধুরী/অরুণ কুমার চক্রবর্তী/কবিরুল ইসলাম এবং মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বিচারক ও নির্বাচক মণ্ডলী ঃ শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/পবিত্র সরকার/তরুণ সান্যাল/উজ্জ্বল মজুমদার/ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত/অর্ঘেন্দু চক্রবর্তী/প্রণব চট্টোপাধ্যায়/জলবন্ধু কুণ্ডু/কানাই ঘোষ/অমল রায়/দিলীপকুমার মিত্র/ সুমিতা চক্রবর্তী/সুদেষ্ণা চক্রবর্তী/পবিত্র মুখোপাধ্যায়/কৃষ্ণা বসু এবং অন্যান্য মিত্র।

সম্পাদক ।। কফিহাউস

কফিহাউস

শারদীয়া ১৪০৭

সূচি

বর্ণানুক্রমিক (Alphabetically displayed)

[বর্ণানুক্রম রক্ষা করতে গিয়ে অনেক অগ্রজ ও অগ্রণী লেখককে পিছে চলে যেতে হচ্ছে, সেইজন্য সম্পাদক দুঃখিত]

বিষয় কলম লেখকের নাম

সম্পাদকীয়

এ সংখ্যায় : ২—১২ ○ ঈশিতা ভাদুড়ি ○ উত্তম দাশ ○ গণেশ ভট্টাচার্য ○ প্রদীপচন্দ্র বসু
আটজন আমন্ত্রিত ○ বীথি চট্টোপাধ্যায় ○ মন্দাক্রান্তা সেন ○ স্মরণজিৎ চক্রবর্তী এবং
কবির গুচ্ছ কবিতা ○ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

অণু-কবিতা : ১৩—৫৮ ○ অমলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ○ অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ○ অসিতকুমার দাস ○ অভিজিৎ ঘোষ ○ অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ○ অজিত মণ্ডল ○ অজিত বসু ○ অনল চৌধুরী ○ অমিয়কুমার সেনগুপ্ত ○ অরিন্দম নিয়োগী ○ অমিতাভ চক্রবর্তী ○ অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ○ এন জুলফিকার ○ কবিরুল ইসলাম ○ কমল দে সিকদার ○ কবিতা মহাপাত্র ○ কবিতা ভাদুড়ি ○ কাজল চক্রবর্তী ○ কাশীনাথ মণ্ডল ○ কানাইলাল জানা ○ কৃষ্ণসাধন নন্দী ○ কেশবরঞ্জন দে ○ কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় ○ গৌরাঙ্গ মিত্র ○ গৌরী দেববর্মন (মল্লিক) ○ চারুচন্দ্র রায় ○ জয়দীপ চট্টোপাধ্যায় ○ জগন্ময় মজুমদার ○ ছবি গুপ্ত ○ তুমুর পাণ্ডে ○ তরুণ সান্যাল ○ তপন গোস্বামী ○ তপতী গোস্বামী ○ তাপস রায় ○ দীপঙ্কর বাগচী ○ দেবাশিস দাস ○ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ○ দেব্যংশু ঘোষ ○ নবকান্ত বড়ুয়া ○ নবকুমার চক্রবর্তী ○ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ○ নাসের হোসেন ○ নিশিনাথ সেন ○ নির্মল বসাক ○ নীলাঞ্জন কুমার ○ নৃপেন চক্রবর্তী ○ পঙ্কজ সাহা ○ পাপড়ি ভট্টাচার্য ○ প্রণব চট্টোপাধ্যায় ○ প্রফুল্ল কুমার দত্ত ○ প্রবীর দাস ○ প্রতাপ সিংহ ○ প্রদীপ ভট্টাচার্য ○ প্রণব কুমার পাল ○ বলদেব দাস ○ বনমালী নন্দী ○ বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় ○ বিশ্বনাথ মাঝি ○ বিপুল আচার্য ○ বিউটি পাল ○ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ○ বৃন্দাবন দাস ○ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ○ মঞ্জুভাষ মিত্র ○ মল্লিকা সেনগুপ্ত ○ মধুরা মিত্র ○ মঞ্জুর রহমান বাবু ○ মঞ্জু বালা ○ মনিরা খাতুন ○ মিহির সরকার ○ মৃণাল চক্রবর্তী ○ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ○ মোহম্মদ সাদউদ্দিন ○ রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডে ○ রফিক-উল-ইসলাম ○ রহমল পুরকায়স্থ ○ রফিক আলম ○ রঞ্জিত রায়চৌধুরী ○ রামরতন মুখোপাধ্যায় ○ রেখা দত্ত ○ শতরূপা সান্যাল ○ শঙ্কর বসু ○ শান্তি রায় ○ শিশির সামন্ত ○ শিবদাস চট্টোপাধ্যায় ○ শিপ্রা সেনধর ○ সমরেন্দ্র মণ্ডল ○ সন্দীপ কুমার ○ সনৎকুমার মণ্ডল ○ সনৎকুমার মিত্র ○ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী ○ সুরমা বসু ○ সুজাতা বিশ্বাস ○ সুনির্মল কুন্ডু ○ ডাঃ সুভাষ মুখার্জী ○ সৌমেন পাল ○ স্বপন শর্মা ○ স্বপন নন্দী

নিবন্ধ : ৫৯—৮০ ○ অশোক রায়চৌধুরী ○ অমিত কাশ্যপ ○ কাশীনাথ ভক্ত ○ নন্দিনী বসু ○ নবকুমার শীল ○ পরিমল চক্রবর্তী ○ বিজনকুমার ভট্টাচার্য ○ রমা দাশগুপ্ত

ছড়া : ৮১—৯৬ ○ অর্পিতা রায়চৌধুরী ○ অশোক মুখোপাধ্যায় ○ অনিন্দ্য দেব ○ আনসার উল হক ○ আলো মজুমদার ○ উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ○ উত্থানপদ বিজলী ○ জগত লাহা ○ তরুণ সান্যাল ○ দেবকুমার মুখোপাধ্যায় ○ দেবাশিস প্রধান ○ নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ○ নীলাদ্রি বিশ্বাস ○ পবিত্র অধিকারী ○ বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস ○ বেবী দাস ○ যতি মুখোপাধ্যায় ○ মিনতি মিত্র ○ মীনাক্ষি পাল ○ রণেন্দ্র কুমার ঘোষাল ○ রূপশ্রী দত্ত ○ লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ○ শৈলেন কুমার দত্ত ○ সহদেব ধী ○ সতীন বিশ্বাস ○ সিদ্ধার্থ সিংহ ○ সুবোধ সরকার ○ সুরভি ঘটক ○ সুকুমার রুজ ○ সৃজন পাল ○ সেকেন্দার আলি শেখ

English Poems from Bengali pens : 97–100 ○ Broja Chattapadhyay ○ Dr. Manas Bakshi ○ Smt. Rekha Nath

অণু-গল্প : ১০১—১০৬ ○ অভ্রান্ত মিত্র ○ অর্চনা পুরকায়স্থ ○ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় ○ অমল কর ○ অঞ্জলি চক্রবর্তী ○ অসিত কৃষ্ণ দে ○ এ. মান্নাফ ○ কৃষ্ণা বসু ○ গুরুদাস রায় ○ তুষার মুখোপাধ্যায় ○ নিবৃতি রায়চৌধুরী ○ নিতা দে ○ নিখিল ভৌমিক ○ প্রবাল দাশগুপ্ত ○ বাদল ঘোষ ○ বিকুপদ বিশ্বাস ○ বিধান মজুমদার ○ বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় ○ বীরকুমার শী ○ মঞ্জুলা ভট্টাচার্য ○ মুনমুন রাউত ○ রাত্রি বসু ○ রাণা চট্টোপাধ্যায় ○ রামকৃষ্ণ মণ্ডল ○ রূপশ্রী দত্ত ○ শচীন দত্ত ○ শিপ্রা সেনধর ○ সাত্যকি হালদার

অতি বিলম্বে পাওয়া

কয়েকটি কবিতা : ১৩৭—১৩৯ ○ অমিত রায় ○ নীরেন্দু হাজরা ○ নুরুল আমিন বিশ্বাস ○ রমা প্রসাদ মিত্র ○ শুচিস্মিতা মজুমদার ○ সুশান্ত রায়

একটি বিতর্কিত কবিতা ○ সিদ্ধার্থ সিংহের না-অণুকবিতা ও অন্য মিঠে-কড়া সমালোচনা

প্রসন্ন হৃদরোগ : ১৪১—১৪৪ কথা বার্তা : ○ ডাঃ সৌরাংশু চট্টোপাধ্যায়, এম ডি, (কার্ডিওলজিস্ট) কথায় অশোক রায়চৌধুরী।

প্রকাশিত রচনাগুলোর উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া : ১৪৫—১৪৮ অভ্রান্ত মিত্র ও উগ্রসেন।

উপদেষ্টক : ডাঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়/তরুণ সান্যাল/উজ্জ্বল মজুমদার/সুদেষ্ণা চক্রবর্তী/সুমিতা চক্রবর্তী/দিলীপ মিত্র/অর্ধেন্দু চক্রবর্তী/কৃষ্ণা বসু প্রমুখ

সহসম্পাদক : শংকর বসু/দেবকুমার মুখোপাধ্যায়/এ. মান্নাফ/প্রতাপ সিংহ/অনিন্দ্য দেব/সুজাতা বিশ্বাস/রূপশ্রী দত্ত প্রমুখ

প্রতিনিধি সম্পাদক : বাংলাদেশ : মঞ্জুর রহমান বাবু/আমজাদ হোসাইন/নোমানুল হক শহীদ/আসাম : ছবি ওঝা/কুমুর পাণ্ডে/দিল্লী : কিরণশঙ্কর মৈত্র/রেখা নাথ/মুর্শিদাবাদ : অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত ও নুরুল আমিন বিশ্বাস/২৪ পরগণা : অঞ্জলি চক্রবর্তী/বীরভূম : চারুচন্দ্র রায়। উত্তরবঙ্গ : মৃণাল চক্রবর্তী ও শিপ্রা সেনধর।।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক : অমল রায়/ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস/পম্পা চক্রবর্তী/জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক : অশ্রীশ রায়চৌধুরী

কো-অর্ডিনেটর : অর্ণব চৌধুরী

অসম্পাদকীয়

★ কফিহাউসের সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত লেখক-লেখিকারা আত্মসম্মান বজায় রেখে সাহিত্য করুন।
না চাইতে কোথাও লেখা পাঠাবেন না।
দশবার চাইলে একবার পাঠাবেন। পত্রপত্রিকার অফিসে অফিসে ভিখিরির মতো ঘুরঘুর করবেন না।

★ কফিহাউস কোন প্রতিষ্ঠানবিরোধী পত্রিকা নয়। প্রতিষ্ঠানবিরোধী সাজতে গিয়ে
সে প্রতিভাবিরোধী হতে রাজি নয়।

কেন কিছু পত্রলেখক জানতে চেয়েছেন, কফিহাউস পত্রিকা প্রতিষ্ঠান বিরোধী কিনা ? তাঁরা নাকি কফিহাউসের শ্রেণীচরিত্রটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। কফি হাউস লিটল ম্যাগাজিন, অথচ গ্রেট ম্যাগাজিনের লেখক লেখিকাদের লেখা ছাপে। এবং এই পত্রিকার সম্পাদক গ্রেট ম্যাগাজিনের লেখক লেখিকাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতান ও তাদের সঙ্গে যুগ্ম-কাব্যগ্রন্থও প্রকাশ করেন। ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে তাই না ?

এর উত্তরে জানাই, কফিহাউস কোনো প্রতিষ্ঠান বিরোধী পত্রিকা নয়। কারণ সে নিজেও একটি প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বিরোধী সেজে সে তলে তলে প্রতিষ্ঠানের ভাবকতা বা পদলেহন করে না। প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাজতে গিয়ে সে প্রতিভা বিরোধী হ'তে রাজি নয়। কফিহাউস প্রতিভার পূজারী। প্রতিভাকে সে মাথায় করে রাখে এবং অপ্রতিভার অহংকার, দম্ভ এবং ঈর্ষাপরায়ণতাকে সে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যায়। অনেকেই শত চেষ্টা চরিত্তির করেও প্রাতিষ্ঠানিক পত্র পত্রিকায় কলকে না পেয়ে অবশেষে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বনে যান এবং প্রতিষ্ঠানকে গালাগালি করেন। তাই কফিহাউস grapes are sour — এই প্রবাদ বাক্যটিকে তার নিজস্ব অভিধান থেকে মুছে ফেলতে চায়। তবে কফিহাউস পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত লেখক লেখিকাদের কাছে আমার অনুরোধ, পরামর্শ, নির্দেশ কিম্বা আদেশ, কেউ কোথাও অযাচিতভাবে লেখা পাঠাবেন না। সে লিটল ম্যাগই হোক আর গ্রেট ম্যাগই হোক — দশবার চাইলে একবার লেখা পাঠাবেন। (যদিও দশবার কেউ চাইবে না। তবুও মেজাজটা সেরকমই রাখতে হবে।)আর যেসব বাজারি প্রতিষ্ঠানিক পত্র-পত্রিকা, কারো লেখা চায় না, সেসব জায়গায় লেখা পাঠাতে ইচ্ছে হলে ডাকে বা পত্রবাহক মারফৎ পাঠাবেন (সম্পাদক তাই করেন)। নিজে গিয়ে তদ্বির তদারকি বা ভিখিরির মতো ঘোরাঘুরি বা উঞ্ছবৃত্তি করবেন না। আত্মসম্মান বা আত্মমর্যাদা বজায় রেখে সাহিত্য করুন। আগে আত্মসম্মান পরে লেখা ছাপানো। কফি হাউস পত্রিকা ছোট, বড়ো, প্রতিষ্ঠান, অপ্রতিষ্ঠান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান সবার জন্য, — সবার দিকে সে হাত বাড়িয়েই আছে। কফি হাউস-এ সবাই লেখা পাঠাবেন — সে লেখা চেয়েই রেখেছে। —নতুন করে আর চাওয়ার দরকার নেই। তবে কারো সমালোচনায় এলার্জি থাকলে অবশ্যই লেখা পাঠাবেন না। কারণ সমালোচনায় আপনি প্রশংসিত বা নিন্দিত হতে পারেন। আপনাকে সমালোচনায় ছিন্ন ভিন্ন করা হতে পারে। তাই সাবধান।

যদি কফিহাউসের পত্রিকা দপ্তরে এধরণের অভিযোগ আসে যে এই পত্রিকার সম্পাদক-মন্ডলীর সঙ্গে যুক্ত কোনো লেখক লেখা ছাপানোর জন্য কোনরকম হীন, অরুচিকর, কুরুচিকর বা আত্মঅবমাননাকর কাজে লিপ্ত (ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে অভিযোগ এসেওছে) তবে তাকে পত্রপাঠ পত্রিকা কমিটি থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত করা হবে। প্রয়োজনে কফি হাউস পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। নো কম্প্রোমাইজ।

সবাইকে শারদীয় সারস্বত শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাচ্ছি।

অশোক রায়চৌধুরী
সম্পাদক।। কফিহাউস

গুচ্ছ কবিতায়

এ সংখ্যার আট জন আমন্ত্রিত কবি

ঈশিতা ভাদুড়ী

প্রেম

তোমার মুখে পেখম তুলে ময়ূর নাচে
তোমার মুখে রজনীগন্ধা রঙীন সাজে

অভিমান

জনারণ্যে এই যে মলেছি কান
তবুও আকাশে ওঠে নি চাঁদ ?

বিরহ

তোমার জন্য সূর্যসকাল, তোমার জন্য রাতের তারা
প্রবল ব্যথায় কেঁদে মরি তীব্র দিশেহারা

প্রতীক্ষা

মেঘে এত বিষাদ, আকাশময় অন্ধকার
কবে ফুটবে গোলাপ ফের আবার !

দাম্পত্য

রুদ্ধ ঘরে যুদ্ধ প্রবল
ঘূর্ণিঝড় ও বহ্নি শিখা

বিচ্ছেদ

শূন্য আকাশ চন্দ্র বিয়োগ
আজকে তুমি বহুদূর

উত্তম দাশ

বিজয়

এতদিন আমরা যে বিজয়ের কথা বলেছি
তার নিজস্ব কোন স্তম্ভ নেই,
কেউ কখনো বরণ করতে আসে নি
কেউ বলে নি ভালো থেকো তোমরা।

পতাকা

কবি পতাকা বইবার শক্তি চেয়েছেন,
এত ভারি, নিশ্চয় দেশি পতাকা।

বিদায়

বিদায় শব্দের একটা অর্থ বিসর্জন
কিন্তু কাকে ? বলা হয় না কখনো।

ঈশ্বর

তিনি বাড়তে বাড়তে অনেক বড় হলেন
ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি ঈশ্বর,
আমি নামতে নামতে অনেক নেমে বললুম
এবার তবে আমি মানুষ হই।

ভারতীয়

সবাই যখন ইংরেজের জামা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে
আমি তখন ভারতীয় কবির ডায়েরি লিখছি,
ঘটনাস্থল ভেজালহীন য়ুরোপ
আর আমি নির্ভেজাল ভারতীয়।

গোপন

একটা গাল বাড়িয়ে দিলুম
জমল না,
দুটো গাল বাড়িয়ে দিলুম —
কানের লতি লাল হয়ে উঠল,
বললো — আজ এই অব্দি।

গণেশ ভট্টাচার্য

বিবাহ

গোপন কোন শর্ত আছে বলে
তোমার দেহে দেখা হতেই
লাগিয়ে দিলাম সবুজ প্রজাপতি _
দেখ দেখ, প্রজাপতি উড়তে ভালবাসে !

সংযম

নিজেরই মন্ত্র জেলে রাখ
জ্বেলে রাখ পাপ ও পুণ্যের কোলাহল
নদীর উপরে নদী বসে থাকুক
কেউ হোক পরিপূর্ণ মানুষ।

আত্মা

লক্ষ্য করো,
প্রতিটি মানুষের ভিতরেই সমুদ্র আছে
কোথাও বিপুল আলোড়নে
কোথাও শান্ত-মমতায়
নিজের ভিতরে কেউ ফুটে আছে ধুতরো ফুল হয়ে

চিহ্ন

চোখ মেলতেই জানলার বাইরে সটান ভোর
দিনটা কেমন যাবে তোর ।

প্রদীপচন্দ্র বসু

গুচ্ছ-কবিতা

এক

কোন আয়নায় ঠিক নিজেকে দেখবো,
বুঝতে পারি না ।
এক এক আয়নায় ধরা পড়ে ভিন্ন প্রতিচ্ছবি,
সময়ের ঢেউ আর পায়ের তলার মাটি
আমাদের এক মুখে অনেক মুখোশ এঁকে দেয়।

দুই

চোখের গভীর শূন্যতায়
সব মনে হয় ভারহীন,
কোথায় হারিয়ে যায় পিছুটান ?
বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, ছায়া নেই _
আলোর বিকল্প এক অন্ধকার খুঁজি
ভার হয়ে চেপে বসবে চোখের পাতায়।

তিন

শূন্য আকাশের চেয়ে গণিতের শূণ্যতা
আরো ভয়ঙ্কর ।
সমস্ত জীবন জুড়ে যে সরল অঙ্ক কষা,
আপাত সরল মনে হলেও তা
খুব কঠিন, জটিল —
যোগ ও গুণের চেয়ে বিয়োগ ও ভাগ বেশি থাকে।

বীথি চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদেষু

বসন্ত (এক)
চিকন দেহে নবীন সুপুরুষ
তখন তুমি সবে বছর ষোলো,
ছাদের কোণে কাদম্বরী একা
তোমার জন্যে বিপর্যস্ত হলো।

রসালস (দুই)
তৃপ্তিহীন ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ, তোমার চক্ষেই মানানসই
তোমার কথা বলা, একটু ঝুঁকে চলা, বিদ্যানাময় আজ
তোমার বই ।

নিত্যরাস (তিন)
সময় সেদিন মুচকি হেসে অনেক দূরে গেল
প্রৌঢ় তুমি অমন মুখে আশঙ্কার রেখা,
হাজার স্তুতি ভীষণ ভিড়ে আকুল ভাবে একা
তোমার বাহু মুগ্ধ বালিকাকে তখনই ঠিক করল
এলোমেলো।

রূপবিস্ময় (চার)
কেমন মায়াবী আঙুল তোমার ছিল ।
যে ছুঁয়েছে ঐ আঙুলের হাতছানি,
কোমল অথচ জ্বলন্ত পৌরুষ —
সংজ্ঞা হারাবে তার ডানহাতখানি।

রসোদ্গার (পাঁচ)
কে ছিল তোমার পাশে সেইদিন,
আমি ছিলাম না কেন ?

আমার প্রতিটি শরীরী অণুতে তোমারই চক্ষু যেন,
তোমার রূপের এই আবেদন বাড়ায় আমার ঋণ।

মন্দাক্রান্তা সেন

কয়েক টুকরো

।। ঈশ্বর ।।
ঈশ্বর আমাকে ছেড়ে চলে গেছে দশ দিন হ'লো, বড় অগোছালো থাকি, কথা বলি সাজানো কঠিন হ ব ক'রে বেড়ে গেল বয়স, লাঠিও টলোমলো ঈশ্বর আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছে মাত্র দশদিন।

।। কৃষি।।
আমাকে কোদাল দাও, দেহময় এবড়োখেবড়ো পাপ সমস্ত সমান করব, না পারি, বাসিয়ে নেব ধাপ হাওয়ায় বীজানু ওড়ে, আমার পাপের মাটি ভিজে অন্তত কোদাল দিও ... কত আর পারব নিজে নিজে

।। শাস্তি।।
এমন কঠিন শাস্তি দিও না আমাকে, যাতে তুমি নিজেই যন্ত্রনা পাও, ম'রে যেতে থাকো প্রতি পলে দু'দিকে আকাশ ভাঙে, পদতলে ম'রে যায় ভূমি আমার পাপে কি এত জোর, যাতে তোর স্বর্গ টলে ।

।। ভাগ্য।।
সে একজন জন্মেছিল দুর্বিনীত ভাগ্যরেখা নিয়ে সে বলল : দক্ষিণে যাব। তার রেখা চ'লে গেল বামে শখের চাবুক কিনে রেখেছিল দেয়ালে টানিয়ে চাবুকের রেখা বদলে তাকে বেঁধে ফেলেছে লাগামে।

।। দেনা ।।

কলমে যে শব্দ আসছে তারা গতজীবনের চেনা এ-জন্মে
তাদের আমি এতদিন বিস্মৃত ছিলাম একটি ক'রে শব্দ
উঠে আসে। মনে পড়ে প্রিয়নাম সহস্র জন্মের পর শোধ
হয় একটি একটি দেনা।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

কুশল

হঠাৎ আকাশে যখনই সে আসে
আলো
হলুদ কবর তোমার খবর
ভালো ?

বোধ

শীতকাল কাটিয়ে তুলতে আমি রোদ চাইলে
যখন রসুন আসে, আমি জেনে যাই
একজনের পাকা দেখা হ'য়ে গেল

বিচ্ছেদ

হাতের পাতায় মেঘ, জল, শর্করা
তোদের পাড়া
তাই নিয়েই পেরিয়ে এসেই ফাঁকা মাঠ ...
তোর প্রজাপতি-যজ্ঞে আমি কখনো খড়, কখনো কাঠ

ব্যাস

বৃষ্টি যখন শুরু তখন উল্টো পাল্টা জল
ঝাপ্‌টা দিয়ে বুঝিয়ে দিল গভীর জঙ্গল

ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে অরুণকান্তি হেম ...
মেঘের নীচে আয়ুষ্মপূর্ণ ভেজস্ক্রিয় হাত
শহর জুড়ে লিখে রাখছে বিচ্ছেদ আর প্রেম।

আরোপ

আঁকা বাঁকা রাস্তা হোক
মাথা ধরা, শপিং উইন্ডোর শোকগাঁথা,
সি. এফ নগরী পার হ'য়ে বন্ধুগণ শোনো
চেয়েছি সহজ রাত্রি শুধু
কবিজন্ম চাইনি কখনো

ক্ষত

এখন ভাঙন ....., ধ্বস্ত নদীর পাড়
আঁচল খুলে দেখিয়ে দিল জলের বিস্তার

বাঁশিওলা

যখনই পেরেছি	স্বপ্ন রেখেছি	দর্পণে
শালপাতা ওড়ে	হাতে হাতে ঘোরে	বর কনে
মালা ছিঁড়ে যায়	পালক হারায়	বুলবুলি
দৈত্যরা প্রভু	ভাঙ্গ বাঁশি তবু	সুর তুলি

• • • • • • • • • • •

উত্তম দাশ সম্পাদিত

শতাব্দীর বাংলা কবিতা

শতাব্দীর বাংলা নিদর্শন এই জাতীয় সংকলন। ৮০ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ভূমিকায় এ সময়ের কবিতার আন্তর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত। বই মেলায় বেরুবে। দাম ২০০ টাকা।

উত্তম দাশ

এক ভারতীয় কবির ডায়েরি থেকে ৩০.০০

কল্পনাটা ও কবিতা ৫০.০০

এদুটি কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতার ভালোমন্দের সীমানা ভেঙে নতুন চিত্রকল্পের বইয়ে দিয়েছে।

মধ্যমগ্রাম ● পদ্মপুকুর ● ২৪ পরগনা (উ) ৭৪৩১০২

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কয়েক টুকরো

এক

আবার যদি জন্মে ফিরে আমি
দেখবে গলায় লেগে আছে
গতজন্মের শব্দফাঁসি।

দুই

ওভাবে বলোনা, শ্রুতকথা বড় ভুল ব্যাখ্যা দেয়
জানালায় আকাশ ঢোকেনা, ভালবাসা কালো হয়ে যায়।

তিন

এই নাও মেলে ধরলাম দু'আঙুল
এক আঙুলে বিষ-আছে, অন্যটিতে ফুল !
এক ভুলে সর্বনাশ, দ্বিতীয়তে তুমি
পেয়ে যাবে বাঙ্ময় ফুলের গন্ধ
শব্দের চরণচারণ ভূমি।
দেখি তুমি ছোঁও কোন ভুল ।

চার

জ্যোৎস্না শুয়ে ছিল গাছে
তাকে আমি নামিয়ে মাটিতে আনি।
এখন আমার কাছে
কোনো আলো নেই আর।
একটা গান আসার কথা ছিল, জানি
কোনো কোনো গান পুরুষকে পছন্দ করেনা,
সব গাছ ভোর এলেও সমান জাগে না ।
আমি ভাবি, আমি দেখি, আমি শুনি
অথচ এরা কেউই শব্দে নামেনা।

কফি হাউস

যাঁরা অণুসাহিত্যপ্রেমিক কেবল তাদের জন্য। বড়ো বড়ো, বিশাল বিশাল, ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া, ধামসা ধামসা দানবিক লেখা নয়, অণুভাবিত ও আণবিক রচনাই কফি হাউসের অন্বেষণ।

অণু-কবিতা ২-৪/৬ লাইনের/অণুগল্প ফুলস্ক্যাপের একপাতা বা তার কম/অণুনিবন্ধ ফুলস্ক্যাপের ১/২ পৃষ্ঠা/ছড়া-২—৮/১০ লাইনের মধ্যে হতে হবে। বানানভুল, অপরিণত ও বালখিল্যরচনা পত্রপাঠ ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে নিক্ষিপ্ত হবে।

প্রতিটি রচনার ওপর তীব্রতীক্ষ্ণ সমালোচনা হতে পারে। সমালোচনায় আপনি নন্দিত বা নিন্দিত হতে পারেন। সমালোচনায় আপনাকে ছিন্নভিন্ন করা হতে পারে। এই কথাগুলো মাথায় রেখে তবেই স্পষ্ট হস্তাক্ষরে/টাইপ ক'রে/লেজার কম্পোজ ক'রে, ফুল স্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায়, নীচে সমালোচনা লেখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রেখে লেখা পাঠাবেন।

গ্রাহক না হলে আর কাউকে ডাকে বই পাঠানো হবে না। গ্রাহক মূল্য বছরে ২০০ টাকা। পত্রিকার মূল্য বা ডাক খরচের হিসেব করে নয়। বছরে তিনটি বা দুটি সংখ্যা বেরুতে পারে। কারণ ভালো কবিতা ঘনঘন নিউজ বুলেটিনের মতো বেরোয় না। তবে গ্রাহক হওয়া মানেই কবিতা ছাপানোর অধিকার নয়।

লেখক লেখিকারা সৌজন্য সংখ্যার পরিবর্তে নগদ মূল্যে (৪০% ডিসকাউন্টে) কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউস বিল্ডিং-এর নীচে বঙ্কিম বুক স্টল-এর তপন প্রামানিকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে পত্রিকা-টিকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও।

সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলী
কফিহাউস

অণুকবিতা অণুকবিতা অণুকবিতা

অমলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এক

চোখ তোমার দিকে বাড়িয়ে
মুখ তোমার দিকে বাড়িয়ে
সব তোমার দিকে বাড়িয়ে
আমি দাঁড়িয়ে আছি
তুমি বাক্সপ্যাটরা গোছাচ্ছো তো গোছাচ্ছোই
শেষ ট্রেন কটায় আমি জানি না।

দুই

আশ্চর্য মানুষ আমরা, খুঁজতে খুঁজতে
অনেক দূর চলে গিয়ে শেষে ফেরার জন্য কাঁদি।
পকেটে রুমাল নেই, তবুও দুচোখ জলভার
শ্রাবণ সন্ধ্যার জন্য মধ্যফাগুনেও।
আশ্চর্য মানুষ আমরা, যাবতীয় বিষন্ন বিষয়
বুকে পুষে ঠিক ঠিক শুনে যাই ক্রিকেটের রিলে।

তিন

ছাপোষা কেরানি হবার আগে দুদিন যুবক
নৌকা, নদী, নারী নিয়ে অনিদ্রায় ভোগে।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

সেই কাহিনী

এক

সেই একই কাহিনী চলে যাবার, ঘরে ধান উঠেছে,
এবার শূন্য, চারদিকে খৈ,
কারো কারো অশ্রু হবে, শাদা ফুলের ঋতু তবে
বৃন্তে আনলে, সই !

দুই

সমন্বয়

যা ছিল প্রিয় গহনে গেল না
এমনতরো খেলা এই জীবনের,
ছুঁয়ে দেখার বাতাসও যেন নেনা
নাকি এখন কষ্ট অপার্থিবের ?

এসব জানব নির্জনতা কই ?
কবর যদি বলতে পারে, তখন
সবকিছুতে হয়ত সমন্বয়।
ইহজন্মে পরমতম লগন।

অসিতকুমার দাস

এক

ভেঙে যায় আকণ্ঠ কনকর্ড
আদিমতম ব্রহ্মাণ্ড বিলাস
অখণ্ড কল্পান্ত নেমে আসে
আদিগন্ত গ্যালাক্সি-সত্তাপে।

দুই

দ্যাখো আমরা প্রচণ্ডভাবেই বেঁচে আছি।
তবু কেন আমাদের শরীরে এঁকে দেওয়া হচ্ছে
মৃত্যুর শীলমোহর
কারণ একটা নিহত বিমানের জঠরে
আমরা লুকিয়ে রেখেছি বেঁচেথাকার ভিসা ও পাসপোর্ট।

তিন

মেঘ বলে তুই অতি নিদারুণ হাওয়া
চুপচাপ আকাশটা, কেন বয়ে যাওয়া ।
যে আকাশে বড় হই তাকে দিই ফাঁকি
অচিন একোন দেশে ঘুরে যেতে থাকি !

চার
অভিন্ন ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্র আর
মঙ্গলবাস ক্রেডিটকার্ড নিয়ে
স্বর্গথেকে যাত্রার কোটি বছর পরে
যে গ্রহে আমাকে অভিবাসন দেওয়া হল
তার আর এক নাম নরক।

অভিজিৎ ঘোষ

মহাদেবী সরস্বতীকে নিবেদিত

১. আমাকে সাজাবে তুমি ফুলের সজ্জায় ?
স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের যক্ষর থেকে
যত্নে চয়ন করো প্রিয় বর্ণমালা।
মন্ত্রের ধ্বনিতে গাঁথো;এবং
বাহ্যাভ্যন্তরীন শুদ্ধিতে উচ্চারণ করো
আত্মভাব-ধারা ...

২. অর্দ্ধেক সত্যে নির্ম্মিত ভ্রান্তির মায়া
নিরাবরণে প্রকাশিত অশরীরী ছায়া
সর্বত্রই সরহস্য ষড়ঙ্গে
ফুটে ওঠে জীবনের বর্ণময় রূপের অরূপ ...
ওঁ তৎসদিতি' মন্ত্রেও দেখি
মহাশ্বেতা, বীণাপানির স্থিতি ...

৩. অনন্ত যৌবনা'র রূপসী অঙ্গে
যখন এসে মিশে যান অনন্ত দেবতা
তখন, তিনি কাব্যলক্ষ্মী ।
তখন, তিনি জীবন-সবিতা ...
আশ্রয়বিহীন এ তুচ্ছ জগতে একমাত্র
কবিতা আমার প্রাণ ...

৪. অদ্ভুত রহস্যময়এ পঞ্চ তন্মাত্রে
'তৎ সবির্তুবরেণ্যং রূপে
কখনো দর্শন দেন তিনি ...
পরমেশ্বরীর শরণাগত হলে
দর্শন পাই, শ্রীময়ী চরণের ...

অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমত
পাপের গর্ভ থেকে
যে ভস্ম জন্মেছিল কাল
আজ তা ভক্তি হয়ে
বাতাসার লুঠ।।

দ্বিতীয়ত
অন্ধ শিশুর জ্যোতিহীন চোখে
আজও তুমি আলোহীন,
হে ঈশ্বর
আরও একবার অস্বীকার করলাম তোমায়,
আমাদের বড়ো আলোর প্রয়োজন।।

তৃতীয়ত
ভালোবেসে মালা নয়
ফুল দিও,
কারণ মালায় ভ্রমর বসেনা।।

অজিত মণ্ডল

জীবন
এক
সরীসৃপ ঘুমের ভেতর
ক্ষুধার্ত শরীর সিঁড়ি ভাঙছে
প্রতিদিন সময়ের ছিদ্র ভরে
বেচলার বাসর সাজায় বর্বর জীবন।

দুই
ঘর আর ঘরণীর দুর্বোধ্য পাঠ
কণ্ঠহীন বিন্যাসে ক্ষয়ে যেতে যেতে
আমৃত্যু অবেক্ষার তীর ছুটে চলে
রহস্যের অস্পষ্ট ঠিকানায়।

অজিত বসু

তাপপ্রবাহ
দড়ির এধারে ওধারে আগুন,
দুদিক দিয়েই এগিয়ে আসছে বিধ্বংসী মিলন
মধ্যিখানে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' এক মূর্তি, আড়ষ্ট খুঁজছে,
পাত্রে পায়ে পিছোচ্ছে, ছুটছে —

দেখছে, সেখানেও তাপ
রাস্তাটাও ক্রমশ আগুন হ'য়ে উঠছে ।

অচল
কালকের অতিবিক্ত রজনীগন্ধা
আজ ডাস্টবিনে —
আজ আবার নতুন রজনীগন্ধা ।
লোকটা কিন্তু পুরনো,
পাল্টাচ্ছে না ।

ঘোটানা
মুহূর্ত ভীষণ ক্লান্ত।
এক স্তম্ভিত ছায়া তার ওপরে ।...
ওধারে আলো — সে ক্লান্তিহীন জ্ব'লেই যাচ্ছে ।

অনল চৌধুরী

ক্ষণ-চিন্তা

এক
মনে কি পড়ে চিনিয়ে ছিলাম সপ্তর্ষির মালা
ধ্রুবলোকের পথ দেখানোর সপ্ত ঋষির জ্বালা
বশিষ্ঠ তার সঙ্গী নিয়ে দীপ্য আঁধার রাতে
তবুও আছে অমর্ত্য দীপ অরুন্ধতীর হাতে।।

দুই
মদিরেক্ষণা, তোমার চাহনি চিনি
অনুভবে বুঝি ঈঙ্গিত বিকিকিনি
বুকের মধ্যে জমে থাকা যন্ত্রণা
তুমিতো বোঝনা, সবই তাই বঞ্চনা।।

তিন
অনেক-পথ তো চলেও দেখি অনেক পথই বাকী
সুরুর দিনের সঙ্গীরা সব হারিয়ে গেছে নাকি ?
এখন যাদের সঙ্গে আছি ভালোবাসার টানে
কতটা পথ যাবার আছে তারাও কি তা' জানে ?

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

কবিতাগু

প্রণয়
দুরারোগ্য ব্যাধি। তবু কী করে' যে বেঁচে আছো তুমি
সেটাই আমার কাছে যুগপৎ গর্ব ও বিস্ময় —
যখন জগময় মরীচিকা-স্বপ্ন মরুভূমি
তখন এ বেঁচে-থাকা পাথরের নির্জীব প্রণয়।

শ্রীকৃষ্ণ-ভাষণ
ধৃতরাষ্ট্র, রাষ্ট্র ধরো;যুধিষ্ঠির, যুদ্ধে থাকো স্থির;
দুঃশাসন, মেনো না কো কোনোকিছু শাসন-টাসন;
দুর্যোধন, ক্ষান্ত নও যোধনে। কাজেই পৃথিবীর
নাড়িশ্বাস । হে অর্জুন, কই গীতা, শ্রীকৃষ্ণ-ভাষণ !

বারুদে ও বন্দুকে
রাত্ত দিন, ফিকে হয়ে আসে, রঙ
শিমুলে ও কিংশুকে।
অস্ত্র হয়েছে ভোঁতা —
অন্ধ ওদের দেখে যায়, আর
বধির ওদের শ্রোতা ।

অরিন্দম নিয়োগী

জলমণি রায়

জলের কোন প্রতিভা নেই
সে কেবল নিঝুম নদীর তীরে
একরাশ কাশ ফেলে
আঘাত থেকে সীমাহীনতার দিকে
উড়ে যায়

ছায়াবাহার
বুঝতে না পারার মনোবেদনায়
আমি তার ছায়া ছুঁয়ে প্রণাম করি
আর সে ছায়া হারিয়ে
কিলবিল সহরের ছায়ায়
শুধু থুতু ফেলে যায় ...

অমিতাভ চক্রবর্তী

কবিতিকা

এক

তুমি খুব সুন্দর,
"তুমিও"
তোমাকে খোলা-চুলে বেশী ভালো লাগে,
"তোমাকে নীল হাফ্ শার্টে";
তোমাকে লিপস্টিকে — কাঁচটিপে,
"তোমাকে গোঁফে ও দাড়িতে।"

দুই

কি চাই তোমার,
টাকা ? ফুল ? শরীর ?
কি চাই তোমার,
বাতাস ? আগুন ? জল ?
কিছু না, কিছু না, কিছু না,
শুধু তোমার হৃদয় !

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়

শ্বেত সন্ত্রাস

এক

পাতাল
দেখবো বলে,
সূর্য গিলেছি
সাতসকালে,

দুই

যতি চিহ্নে যতি দে,
লোনা জলের দরিয়ায়
আমি তোর কাণ্ডারী হবো,
দীর্ঘশ্বাসের পাষাণকে স্মৃতি করে
শোনাবো চন্দ্রমোহনার গান।

তিন

আমি যদি নির্বাক মমি
তুই তবে মনের মুকুর
আমি মতো শিকড়বাকড়
তোর পায়ে নদীর নূপুর।

এন. জুলফিকার

দিন যাপন

কে কার জন্য ঘোরে কুহক মায়ায়
দূরাভাষে মূক হয় অতি চেনাস্বর
মেদুর দুপুরগুলি শালিকের খুনসুটি ডাক
সহসা ভাসায় কেউ চেনাপথ, ঘর।

কবিরুল ইসলাম

স্পর্শপ্রিয়

তুমি স্পর্শপ্রিয় কিনা জানি না
আমি কিন্তু স্পর্শাকাতর জেনো,
কখনও কখনও আমি স্পর্শাতীতও বটে
ধ্যানেরও অধিক ধ্যানী
সে সব মুহূর্তে আমি ভুলে যাই,
কে বা পর কে বা আপন।

বিঃ দ্রঃ —

কবিরুল ইসলামের এই—'স্পর্শপ্রিয়' কবিতাটি সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন কফি হাউস-এর সহ:সম্পাদক আবদুল মান্নাফ। কিন্তু হাতের লেখা দেখে সন্দেহ হয় এটা কবিরুল ইসলামের নতুন লেখা কিনা। গতবারের মতোই আবদুল মান্নাফ তাঁর মুদ্রিত কোনো কবিতা কোনো পত্রিকার পাতা থেকে টুকে এনেছেন কিনা ? আর তাই যদি হয়, তবে এবারেই শেষ। এরপর এ মান্নাফ বা কবিরুল ইসলাম কারও লেখাই আর কফি হাউস-এ ছাপা হবে না।

সম্পাদক/কফি হাউস

কমল দে সিকদার

ঘুম (এক)

স্পর্দ্ধিত উচ্চতায় এমন
অসহনীয় স্তব্ধতার ভিতর
তুমি বসে আছো ভাবলেশহীন
যেন সমস্ত মেনে নিয়ে অতীত পাথর

ঘুম (দুই)

তবু ফেরালে না মুখ
দেখ রিনি, তোমার অলৌকিক আঁচল থেকে
অভিমানের মতো বিষণ্ণ সন্ধ্যা
টুপ করে ঝরে গেল পৃথিবীর মাটিতে
এবার রাত্রি এলে ঘুমোবে মানুষ ...

কৃতঘ্ন (তিন)

প্রাচীন নাবিক আজ নতজানু
নিজস্ব ডিঙ্গাটি উল্টে রেখে
লোকালয়ের দিকে হেঁটে যাব
এত বড় কৃতঘ্ন আমি নই

কবিতা মহাপাত্র

চূর্ণ কবিতা

এক

আমার আঁধার ঘরের আলো
কোন প্রদীপে ভরবো ভুবন।
ব্যথার বাতাস হোল কালো
ও রজনী, তুমি গন্ধসুধা ঢালো।

দুই

যন্ত্রণা খুঁজে নেয় গেরুয়া কৌপীন
যন্ত্রণায় স্বস্তি দেয় সুগন্ধি কফিন।

R-10974

তিন

এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে
জেগে আছো নিরন্তর
মোমগলা অন্ধকারে
পাওনি ঠিকানা নিরুত্তর।।

চার

কুবোপাখিটা কোথায় যেন ডাকে
শীর্ণতোয়া নদীর ছবি কি কেউ আঁকে।।

কবিতা ভাদুড়ী

ভালোবাসায় কবর দিল কে

এক

কোন অন্ধকার আসছে তেড়ে কে জানে
মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান ভালোবাসায়
কবর দিল কোন ছায়া
আমাকে কষ্ট দিয়ে কেমন থাক তুমি
কেমন থাকে রাতের ঘুম ভরা চোখ,
মোচড় দেয় বুকের মাঝখানটা।।

লজ্জা

নারীর নাভির নিচের ঠিকানা পুরুষের ঘর
সাপের মত ফনা হয় শরীর নারীর ঘর করি শূন্য দুয়ারে
শবদেহ হয়ে, আগুন হয়ে — জল হয় উষ্মানা।

কাজল চক্রবর্তীর
এক পংক্তিক কবিতাবলী

পর্যটন

জন্মাবার পরে মৃত্যুইতো শেষ আশ্রয়।

তন্ময়

ভালবাসার কোন ভাষা নেই।

বন্ধুত্ব
স্বপ্নের সাগরে চারহাতে সাঁতার কাটা যায়।

ঋতুপর্ণা
আঁচলের সাহায্যে—বালক পুরুষ হয়ে ওঠে।

শিল্পী
কবিতা ও খাদ্য পরস্পরের পরিপূরক নয়।

দূরত্ব
বিয়ের পরেই সম্পর্ক ঢুকে পরে সন্দেহের নোনাজল।

কাশীনাথ মণ্ডল

এক
দাহপত্র রাখবে কোথায় সব আসনেই জল
পচন লাগে চোখে মুখে আগুন কোথায় বল্

দুই
নদী বলে আমি নেই সাগরের ঘরে
রাধাচূড়া প'ড়ে আছে চোরা বালির চরে

তিন
মেঘ ওড়ে কলমে দেখে কালিদাস
ধুলো ওড়ে ইতিহাসে উটের আকাশ

চার
কবি থাকে মনে কবি থাকে বনে
শহরের কবি থাকে রবীন্দ্র সদনে

কানাইলাল জানা

পিঁপড়ে (এক)
পিঁপড়ে পিঁপড়ে পিঁপড়ে
সত্যিই আমি এখন এক পিঁপড়ে
যে কিনা খাদ্যকণা ভেবে
মাথায় করে চলেছে আও পৃথিবী
আর যার পায়ের তলায়
পিষে মরছে অসংখ্য
ব্রাহ্ম মুহূর্ত –

মেঘ (দুই)
মনে কর মেঘে মেঘে জল নেই
বিষাদে ভরা
আর সেই মেঘ ভেঙে পড়ে
আলোকময় বৃক্ষের মাথায়
তারুণ্য (তিন)
সীমান্তের তরুণদের হাতে এখন
ছোট ছোট পিস্তল
মনে কর সেই পিস্তলে গুলি নেই
ওম ভরা ...

কৃষ্ণসাধন নন্দী

রণ কৌশল

দম ফুরাল এবার, হাঁটি হাঁটি, কেটে পড়োবাবা 'বশংবেদ ঠুকঠুক চলে না — বাড়িয়োনা থাবা' দৃশ্যপট বদল হচ্ছে নিয়তই ঘোরালো প্যাঁচালো জ্ঞানবৃদ্ধ এরা সব কচিকাচা নববইএর আলো।
রণকৌশল জানা থাকে অভিমান ছেড়ে যুদ্ধসাজ প্রকরণ, প্রহরণ শস্ত্র নিত্রে উত্তর পঞ্চাশ।

কেশব রঞ্জন দে

মুখোশ এখন
জলজল পাথর চাপিয়ে
হাসছিল সে মুখোশ পরে
মন্দিরের ঘন্টা ছিঁড়ে পড়তেই
সব কিছু ফাঁস — সব ফাঁস।

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

এক মাঘে
তুমি আমার গায়ে কাদা ছুঁড়লে
আমি দাঁড়িয়ে দেখব সে বান্দা আমি নই।
আমি জানি অন্ধকারে কি ভাবে অপেক্ষা করতে হয়।
আলোর জন্য
এক মাঘে শীত যায় না হে ।

গৌরাঙ্গ মিত্র

খনন

গাছের জন্ম দেবে
মাটি
দানাবীজ পেলে।
মাটি, তুই পরার্ধযোনি,
সহস্রলোচন
তোরই ব্যাভিচারী ছেলে।

হ্যানসেন'স ডিজিস্

বেদনার অ্যালবাম উধাও —
সমাধিস্তূপে ব'সে
চিমটি কাটি নিজের হাতে
আড়ালে আবডালে।
একটু যদি লাগত ।

গৌরী দেববর্মন (মল্লিক)

তোমার জন্য

বুকের গহ্বরের কূলঙ্গীতে রাখাআছে কিছু প্রলাপ।
আমার খোলা দরজা তোমার জন্য।
অশান্ত যৌবন, নদী ও নবান্ন।
পারের তলায় মাটিতে শস্যক্ষেত
পেরিয়ে হতে হবে উত্তীর্ণ।

হারিয়ে গেছি

আর প্রয়োজন নেই আমার।
স্বপ্ন দেখা তোমাকে ঘিরে
হারিয়ে গেছি আমি
জনতার ভিড়ে।

চারুচন্দ্র রায়

চূর্ণ কবিতা

এক

এখানে কেবলই খিদের খুদ কাঁড়া কথিত কাহিনী
ডুমুরফুল সন্তর্পণে মুখের জলজ আবরণ ঢাকে।

অনাবৃত মেঘ বাগানে নরম নক্ষত্র বাহিনী
ভাঙ্গা ঘরে অশ্রুরা অশ্রুর আলিঙ্গনে শুয়ে থাকে।

দুই

ধৌত চাঁদ নিভে গেলে আয়ুষ্মান অন্ধকার অবনত
স্বপ্নগুলি হয় ক্রমাগত দীর্ঘ, রাত্রি হয়ে যায় ছোট।
ভয়াল দৃষ্টিতে জড়িয়ে থাকে সমূহ সমর্পন পদাবলী
কুসুমের পরতে পরতে অমোঘ যেমন আলি।

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়ের ক্যাপসুল-কবিতা

জিজ্ঞাসা

আমার ছোট্ট মেয়েটি সব কিছু জানতে চায়। গতকাল টিভি দেখতে দেখতে ও আমাকে জিজ্ঞেস করছিল 'বাবা, গণতান্ত্রিক দেশ মানে কি ? আমি বলেছিলাম, নিজেকে তৈরী করো।

উপলব্ধি

সেদিন সমৃদ্ধি ভবনের ১৩ তলা থেকে দেখছিলাম প্রিয় শহরকে। দৃষ্টিকোণে দেখছিলাম হাজারো সচল মানুষকে। গোধূলি বেলায় তখন সূর্য ডোবার পালা। সহসা মনে হল, ওপর থেকে আমাকে দেখতেও তো একটা পিঁপড়ের মতো, নগণ্য।

জগন্ময় মজুমদার

কলম বা জন্মের প্রজাপতি সিরিজ

এক

কোনো কোনো কলমের মুখে বড়ো বিষাদের ছায়া ভারি হ'য়ে ওঠে বুক
ভেতরে উথাল রাত্রি জমে জমে মেঘ

দুই

আজ আমি আমার জন্মের প্রজাপতিটাকে দেখলাম কেউ তাকে মাখনপোকাও বলে;আমি তো অবাক, ফুল নয় সে আমার কলমে বসেছে।

তিন

রিফিল শরীর ওর রিফিলের মুখে তীক্ষ্ণ পুঞ্জমেঘ উপরে
খোলস এক ভায়োলেট দুপাশে নির্ভার ডানা ভাঁজবদ্ধ
অরণ্যগরিমা

চার

যখন সে খুলে যায় অভ্যাস খোলে, খোলে না স্বভাব এই
সোনোমোনো নিয়ে তার মনোবিকলন আবার জমতে থাকে
রাত্রি মেঘভার

ছবি গুপ্তা (আসাম)

টুকরো

এক

সম্মুখে সুতপা নদী, ভয়নেই কিছু হারাবার
সকলি হারানো যায় তার নাকি গোপন উল্লাস
পরকীয়া পরবাস, পুষ্পাধার লুকোবে কোথায় ?
পদ্মগন্ধী দেহতাপ, আস্রুত গহীন জলাধার।
অবিনাশ অবিনাশ অন্তরালে সুনিপুণ স্নান
প্রবিনাশ অবিনাশ — অভ্রান্ত জাগরণ তোমার।

দুই

ব্রতজ জলের ঢেউ শ্যামরং বিনীত অক্ষর
অমল শরীরী ঘ্রাণ উর্ধতল জলের আগুন,
এল স্পর্শে রেখে চোখ ওড়াও ফানুস, জল জানে,
জলে জমা, জলে ডোবা, কোন দিকে গভীর গমন।

তিন

অনুনয় বৃষ্টিপাত তুমি ঝরে দিলে সারা রাত
স্পর্শ শিহরে আমার মধ্যযামে কেঁপে ওঠে রাত
দুহাত জড়িয়ে তুমি অন্তরঙ্গ করো আয়োজন
বকুল বিজন বেলা বরনায় ভোবানো বিতান।

ঝুমুর পাণ্ডে

প্রত্যাশা

এক

তোমার সারা গায়ে আঁচড়
তবু ফিরে ফিরে আসি
তোমার কাছে নয়, আমার প্রেমের কাছে

দুই

তোমার সঙ্গেই ওঠা বসা
ভালোবাসা, ঘরকন্না
পায়ে পায়ে চলি
তবু শ্বেতগন্ধা রাতে নদী হয়ে উঠি।

তিন

আলের ধারে শুয়ে আছে
ধান কুড়োনি বেলা
চাঁদপানা, মুখ গেরস্থালি
আঁকি বুঁকি, অহঙ্কারী চাওয়া
তোমার কাছে নয়
আমি প্রেমের কাছে নতজানু —

তরুণ সান্যাল

ভ্রমণ

এক

নদী কি কয়েছে কথা তার, ঘাসফুল ছিল হাটুডর ?
চোরকাঁটা বিঁধেছে আঁচলে, কবিতার গুণে অনশ্বর ?
তা এখন বেছে বেছে ঘাসে
চলে যাবো আকাশে আকাশে

দুই

ওদেস্যুস ইথাকার ঘর,
নদী কথা কয়েছিল বলে
ভেসে যাই কালিন্দীর জলে
ক্যালিপ্সোর ট্র্যাজিক প্রহর।

তপন গোস্বামী

জবানবন্দী

নির্জলা দুধের বালক তোমাদের জন্য নয় আমি তাদের
জন্য কবিতা লিখি—
জল মেশানো দুধ খেয়ে যারা বেঁচে থাকে
আর
জীবনে যারা উচিত মতো জল মেশাতে পারে।

মিথ্যে

বালি কাঁকড়ের মতো আমাদের চালে
কিছু কিছু মিথ্যে মিশে থাকে,
— আমাদের প্রেমে থেকে যায় কিছু কিছু খুদ।
এই সব বাদ দিলে আমি আর কতটুকু থাকি !

তপতী গোস্বামী

অণু কবিতা

বীজ বপন করলে এক সময়
ঘন বনানীর রূপ নেয়
সে বনের যত্ন কেউ করুক না করুক
ভালবাসার বীজের ক্ষেত্রেও একই কথা।
মুখরতা ও নীরবতা
দুটো পরস্পর বিরোধী শব্দ
অথচ নীরবতার মুখরতা
অনেক বেশী।

তাপস রায়

অ্যাটম

উত্তরপত্রের একটি শূন্য পাতার মত
সারাটা পাড়া খেলে যাচ্ছে
তুমি আঞ্চলিকতা বলো
দৃশ্যের হিংস্রতায় অথচ তরবারী নেই
দারিদ্র্যই মহান জেনেছে এই গীতাদেশ
জেনেটিক কোড কিছু দৃশ্য অজ্ঞাত রাখে

দীপঙ্কর বাগচী

প্রচ্ছন্ন

অসমাপ্ত বিকেলের দিকে
তার হাত, বাড়িয়ে ধরেছে এক শিখা,
যদি মোম গলে পড়ে — তাপের অধিক
প্রচ্ছন্ন ঐ দিনের ভিতরে তবে কার অশ্রু
সমস্ত মীমাংসা ভেঙে উঠে আসে তোমার তালুতে।

দেবাশিস দাশ

নিঃসঙ্গ পুরুষ

আমার রক্ত জবায় কোনো নথিকা দেবীর পূজো
হয়নি ব'লে — নিঃসঙ্গতার বেদিকায় মন ব্যথিত হলো
আদিমতার নিঃসঙ্গ পুরুষটি ব'লে উঠ্‌লো
ওগো আকাশ — আমাকে একপাত্র কারণ দাও—
আমি সেই কারণ-জল পান ক'রে তান্ত্রিক হবো,
আমার তন্ত্রে তন্ত্রে এখন সেই ক্ষুধা !

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

দুটি কবিতিকা

স্মৃতি

কোথায় ভাঙছে মেঘ কোথায় ভিজছে ঝরাপাতা !
বৃষ্টির হাত ধরে এসেছে স্মৃতিরা ক্রমাগত।
দেখো, একাকার হয়ে গেছে সমস্ত ছবির মুখে ছায়া
আর ক্ষত।

বিস্মৃতি

ফ্রেমের পরিধি থেকে উড়ে যায়
ছবির রঙিন ডানা।
যেরকম অন্ধকার আসে, বিবর্ণ কাজের চোখ
দৃষ্টি হারিয়ে দেখে নগ্ন বিদ্রূপ ।

দেবাংশু ঘোষ

ভীরু চাঁদ

এক

স্তনাগ্রের বিপরীত চাঁদে

স্তনাগ্রের মিশ্রদিশে কালসিটে দাগ

তবু চাঁদ দেখতে কার না ভালোলাগে।

রাত্রি খুশী হয়ে উন্মুক্ত করে দেয় সব,

আর কতখানি বুক দিলে শৃঙ্খলাবোধ ভেঙে

ভীরু চাঁদের আলোয় শুকিয়ে নেবে

সন্ধেবেলার গা-ধোয়া শরীর।

শ্রাবণ

দুই

এক ফোঁটা অশ্রু রাঘব বলে

পৃথিবীর কাছে চেয়েছি শুদ্ধতম মাটি

শ্রাবণী তোমার আঁখে বুকের ভাঁজে

নিরুদ্দেশের মতো এক ফোঁটা অশ্রু রাখা যাবে ।

আসামের কবি

নবকান্ত বড়ুয়ার গুচ্ছকবিতা

প্যালেস টাইন

এক

তাদের আমরা কসাইখানায় দিই ঠাঁই

কারণ তারা আমাদের গোজার ঠাঁই চায়।

আমরাই তাদের হত্যা করি, বাঁচার দাবী

বুলডোজারে গুঁড়াই শস্যের ক্ষেত।

পৃথিবীর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে, সে কার হাত ? এবার

অন্য হাতগুলিও পল্লবিত হবে ... এবং সুড়সুড়ি দিয়ে

যাবে আমাদের মৃত্যুতে। (PALESTINE)

নিভৃত পথ

ফসিল হয়ে যায় পাথরের শ্বাস

শোকার্তে :

ঈশ্বরের ব্যর্থতাই

চোখের জল হয়ে মানুষকে কাঁদায়।

(CLOISTERED)

নৌকাবিহার

একদা নৌকাবিহারে মগ্ন ছিলাম নগ্ন গঙ্গায় ...

গোরস্থানের মাথার ওপর শীতের করুণ চাঁদ

রাত জাগা।

যদিও বাতাস বাদ সাধেনি কোনো।

মনে নেই সে দিনের আকাশ কেমন ছিলো

কিন্তু

ছিলো ..... নিশ্চয় ছিলো।

(ONCE WE WENT A BOATING)

(অসমীয়া থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে সরাসরি

বাংলায় অনুবাদ — শক্তিময় দাশ)

নবকুমার চক্রবর্ত্তী

বিদ্যুলতা

এক

বিদ্যুলিত জীবনে উদ্‌ভ্রান্ত পথ চলায় —

কোন দিগন্ত নেই,

দায় দাক্ষিণ্যহীন এই বসন্ত বাতাস

কখু চামড়ায় সুড়সুড়ি দেয় শুধু।

দুই

মস্তান মাফিয়ারাজ সমাজবাদের কফিনে

শেষ পেরেক ঠুকে — রঙিন পেয়ালায় ভাসে।

ভেসে ওঠে তরঙ্গায়িত মদে মানুষের অহং কংকাল।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

প্রসবকাল

এক

নিবিড় একটি গরু বিয়োবে

কিন্তু চতুর্দিকে এত জ্যোৎস্না যে সে স্বস্তি বোধ করে না।

তার জন্যে স্নেহময়—আঁধার দিয়ো

দুই

নিজেকে না হারালে তাকে পাওয়া যায় না।
হারালে রাখব কোথায়
সে কি মেঘেবৃষ্টিতে দুঃখে আনন্দে থাকবে ?
শিশু-সময়গুলিও তার আদর পাবে না ।

নাসের হোসেন

সে

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এখানে পৌঁছেছি,
তুমি এখনো তেমনই আছ ? সেই অদ্ভুত চাপা হাসি
আর ঝকঝকে ধাতুর দাঁতগুলি, শাড়ির আঁচল কি
তেমনি রাখা আছে সন্তর্পনে ?
যেন কোনো ঝড়ের জন্য অপেক্ষা
সে যদি ওড়ায় ওড়াক

কুয়াশাতাকে

নদীর ওপার থেকে উড়ে আসে শীত।
কনকনে ঠাণ্ডায় শরীর কেঁপে ওঠে
ভালোবাসো, ভালোবাসো বলতে বলতে
আর্তনাদ করতে থাকি। গাছের পাতা থেকে
শিশির ঝরে;আর চার পাশে যে কুয়াশা
তাকে খুব অভিমানী মনে হয়।

নিশিনাথ সেন

কবিতা

যক্ষ্মার রোগীর মত
কালি কাশে খাতার পাতায়
হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, থেমে থেমে
খাতার পাতায়
এভাবে কবিতা আসে
দু'চোখে ঘুমের মত নেমে।

কবি

যেমন ফোটায় ফুল সৌরভ ছড়ায় রোজ
অনেকের মত মিষ্টি হেনা
কবিও কবিতা লিখে মিটিয়ে চলেছে তার
যাদুকর জীবনের দেনা।

নির্মল বসাক

কবিতার সংসার

আজ রাতে কবিতাকে খাবো, সম্পাদক,
তোমাকে দেব কাল কবিতার হাড়
এর নাম কবিতা-সংসার।

অচেনা

ভোরের সাজে ঠিক ছিলো যে হৃদয়াসীনা —
তাতিয়ে দিয়ে, মাতিয়ে নিয়ে
সন্ধে বেলা সন্দেহ হয় — চিনবে কিনা, চিনবে কিনা ।

নীলাঞ্জন কুমার

উপহার

কাকভোরে উদাস হাওয়ার ঢল নামে। প্রেমপ্রীতি খুঁজে ভাসে শহরে ঘরে দোরে। নাগরিক ছলনা সে সময় ঘুম ঘোরে। তারমানে যাকে পায় তাকে দেয় সাফল্যের উপকরণ। রোদ এলে ছড়ান হবে পথে। শত নিষেধের তোয়াক্কা না করে।

গন্ডালিকা

সেলুলয়েড খোঁজে দৃশ্য। আর কিছু বাজারী উপলক্ষ। সেটা নিয়ে শুরু হয় শিল্প বোধ। হিসেবী দার্শনিক তাই দেখে মজা লোটে। ইন্টারনেটে বিলিয়ে দেয় সকলের খুশির ভাবনা। বোকাদের এ ছাড়া কি দেওয়া যাবে !

নৃপেন চক্রবর্তী

আকাশ
উন্মুক্ত উদার বুকে
চেয়ে থাকে সে —
বজ্র ও বিদ্যুতে অমলিন !
শব্দহীন উচ্চারণে
তুলে দেয় সব কর্মমাখা
আমাদের অপার আকাশ।

গল্প
গল্প তো নদীর মত
অনিঃশেষ !
চিতার আগুনে পরিশুদ্ধ
আর এক ফিনিক্স !

পঙ্কজ সাহা

কার ব্যাগে কী থাকে
কে কেমন মানুষ কি ভাবে বুঝবে ?
মনের অন্ধিসন্ধি কোন পথে খুঁজবে।
পথ নানা, গেছে পঁচিশ দিকেই
কার ব্যাগে কী থাকে চিনবে তা থেকেই।

মেয়েরা
মেয়েরা সাজলে
তাদের মন ভালো হয়ে যায়,
মেয়েদের চোখ
কাউকে দেখে, কারো দিকে তাকায়।

পাপড়ি ভট্টাচার্য

তিনটি কবিতা
এক
একটি প্রজাপতি উড়ছে মাঝমাঠে
বাতাস দিছে দোল
পাখায় ঢেউ তুলে নাচে প্রজাপতি
পৃথিবীর রোদের তলানিতে একটু ছায়া

দুই
ছায়া ছায়া ঘরে জাগে পরবাস
প্রদীপের আলোয় ছায়া মুছে যায়
আমাদের আলো জোনাকীর ডানা,
থাকি প্রদীপের তলায়।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

মধ্যরাতের ঘর (এক)
যাবার আগেও জানা ছিল না
মধ্যরাতেই চলে যেতে হবে
জমে থাকা কথা নীরবতা
শীতল সিন্দুকে পড়ে রবে।

গোপন কণ্ঠস্বর (দুই)
বুক পকেটে মুখবন্ধ খামের ভিতর ঘর
শুনি গোপন কণ্ঠস্বর
শুনি গোপন কণ্ঠস্বর
এই শ্রাবণে ফিরে আসবে এক
জেগে উঠেছিল পাড়া
তাই মধ্যরাতে বিপুল কড়ানাড়া

একা পথে (তিন)
পথ হাতে নিয়ে
পথ হাঁটছে একা
পথের মাঝে রাত্রি হলে
পথে আর এক পথের দেখা ।।

স্মৃতি (চার)
দুকূল জুড়ে রাত্রি নেমেছে একা
মধ্যিখানে মুখোমুখি বসে নদী
স্মৃতির শিকড়ে পুড়ছিল প্রিয় মুখ
নব জাগ্রত স্মৃতির সঙ্গে দেখা ।।

প্রফুল্ল কুমার দত্ত

এপার ওপার

পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র এবং ধলেশ্বরী
আজো বয়ে যায় বাংলা মায়ের বুকে মুখ দিয়ে দিয়ে
একই সমুদ্র টানছে ওদের, জেনেছে বিদ্যাধরী
মূর্খেরা তবু কলহলিপ্ত এপার ওপার নিয়ে।

থাকবে দূরে খোকা

ভোরের রোদ্দুরে শিশির মাখামাখি মাঘের চরাক্ষেত জুড়ে,
শিশুর কলরব পাখির মতো, সব ছাপিয়ে ডাক মর্জিনা'র
যাসনে দূরে খোকা ! হঠাৎ একবার তাকিয়ে দেখি পিছে
ঘুরে আবার পা বাড়াই—নিয়ম নেই আল-পথের মাঝে
দাঁড়াবার।

প্রবীর দাস

কবিতা

এক
সে এক নদীর তীর ক্লান্ত বাতাস
আয়ুষ্মান বৃক্ষতলে বাউল উদাস,
ভেসে যায় ক্রমাগত জীবনের ছায়া
এত কষ্টও যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন মায়া।

দুই
ধরা যায় না অধরা সময় যেমন
স্থির চিত্র ঘিরে স্বপ্ন তেমন,
অহোরাত্র এ বাঁচার যাযাবর হাতছানি
ভিজে বালি জুড়ে উদাসীন রেখা টানি।

তিন
আরো গভীরে দেখো তুমি কেউ নও
নিদ্রামুখ মুছে দিচ্ছে চাদরের রঙ,
আত্মকেন্দ্রিক মুদ্রারাক্ষস প্রসাধন সারে।
পতন ও নির্মাণ থেকে বাক অদেখা ঘরে।

প্রতাপ সিংহ

কথাকলি

এক
আকাশ থেকে পাঠিয়ে দাও বৃষ্টি
দেখো আমি নদী হ'তে পারি কিনা

দুই
বৃষ্টি নামুক না নামুক নদী
ভালোবাসা ছুটে চলে যায় যদি

তিন
সেরকম শব্দ হ'লে শিশু কেন আততায়ীরাও জব্দ হয়।

চার
দুঃখ এমন এক নদী
যার বালিও ফুরোয় না, জলও থামে না

পাঁচ
পাথরের সামনে টলমল জল
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে যায়

প্রদীপ ভট্টাচার্য

সময় সিরিজের কবিতা

এক
এখন সেই সময় এসেছে
যখন প্রতিবাদী হওয়া মানেই
নিজেকে গর্দভ করে তোলা
নিজেকে ছাড়া অন্য সব কিছু ভোলা।
এই সময় অন্যরকম গান মানেই
তোমাকে ঘিরে ছদ্মবেশী ছুরি ও বোমার প্রস্তুতি।

দুই
এখন এই সময় এসেছে
যখন সবাইকে এক করতে চাওয়া লোকটা
সব চেয়ে বেশী একা এবং উদম নিঃসঙ্গ।

তিন

ভালবাসার জন্য ছুট ছুট এই সময়ে
ভালবাসার লোকটা মরে পড়ে থাকে ফুটপাথে
অনাদরের
আর ছুটচুট লোক কলাবলি করে
ওখানে মরে পড়ে আছে একটা
বেওয়ারিশ পাগল।

প্রণবকুমার পাল

সম্পদ

শরীরে বাসা বাঁধে রূপ ও লাবণ্য
এক সময় হাতছানি দেয় ধুলোয় মিশতে
কিন্তু ধুলো
ধুলোতে থাকে। পচা জলে, সাদা জলে
ধুলো থাকে পৃথিবীর সম্পদে।

চেতনা

মন অহংকারী হলে পায়ের পাতা দেখে
অকিঞ্চিত্ত শব্দে শুকিয়ে যায় গানের ছন্দ।

বলদেব দাস

জলস্রোতে

পরিযায়ী মাছ হয়ে
যখন ছুঁয়েছি তার একক নিভৃতি
জলস্রোতে ভেসে গেছে
নির্মাণের সমূহ সামগ্রী
খোঁজ
আলোর জঙ্গলে
পোশাক পাল্টাবে বলে
সকলেই অন্ধকার খোঁজে ।

বনমালী নন্দী

টুকরো নির্জন

কালগ্রীষ্ম সারা দুপুর হাঁটছে, ছুটছে, বসছে নির্জন পথ
গাছ, টিন, দোতলার ছাদ থেকে ঘনঘন ঝাঁপ তরল আগুন।
সারাটা পৃথিবী কুরুক্ষেত্রজীব ...
নদী ধানমাঠ, পথঘাট আকাশের মস্ত মস্ত পিপাসা
প্রকৃতির কাছে পেতেছে কত অসংখ্য হাত
আমি মানুষ হীন এত হাত দেখিনি আগে ...

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

পকেটমার

দূষিত দৃশ্যের মাঝে
নষ্ট যুবক হাঁটে পশ্চিমি বাতাসে
মান চিত্রে কর্কহীন হোপ, দেওয়ালে ফাটল।
সাবেকী ভারতবর্ষ;
এ কার সংস্কৃতি তোমার পকেটে ?

বিশ্বনাথ মাঝি

ভাঙাগড়া

কিছু ভাঙছে মানুষ
যেমন ভাঙে প্রত্যয়ী সময়ের ঝড়
প্রাকৃতিক কিছু গড়ছে মানুষ
যেমন গড়ে বেলাভূমির ঢেউ, ভাঙনের পর

বিপুল আচার্য

প্রস্তাবনা

এ চোখ স্বীকার করে পাপের উৎকটতা
এ চোখ স্বীকার করে ঈর্ষার লজ্জা
এ সময় অনুভবের, এমন
কান পেতে শুধু শোনা হৃৎপিণ্ডের কর্কশদশার প্রস্তাবনা।

উচ্ছ্বাস ও আমন্ত্রণ

লোডশেডিং-এ একবুক উচ্ছ্বাস
চাদরের নিচে ইমারত গড়ে ও কিশোর বেহাগের স্বরে
রাতকে শোনায় নৈরাশ্যের জীবন গাঁথা
সজীবতা এভাবেই হারিয়ে যায় স্নিগ্ধ প্রলোভনের ভিড়ে।

মাছ

আসলে মাছ চেনা হয় না
জলের আমন্ত্রণ সব সময়ই নিচের দিকে
এ ভাবেই হারিয়ে যাওয়া শুষ্ক বালির আমন্ত্রণে।

বিউটি পাল

হে, মানুষ, সাবধান
হয়তো কোনও একদিন
বেপাড়ার কুকুরের দলকে
যুবতী কুক্কুরীটি নিজস্ব ভাষায়
বলে উঠবে — 'দূর হঃ । মানুষ কোথাকার !
— অতএব হে মানুষ ..... !!

বিবস্বান ভট্টাচার্য

বিষয় নির্বাচন

এক
লিখি লিখি করি, কিন্তু কি লিখি।
বিষয় অনেক আসে, অধিকাংশে এলোমেলোর।
শৈলীতে বাঁধা যায় না। এবং কিছু অন্তঃসারশূন্য।
সামগ্রিকতা স্পর্শ করেনা। অথচ বিপরীতে
একদম সাধারণ কিছু বিষয়, দাগ কেটে গেলে
পাতার আলো জ্বেলে স্মরণীয় রাখি তাকে।

দুই
লিখি লিখি করি।
অল্প কিছুই লিখি
সব কিছু কলমে সরে না।

বৃন্দাবন দাস

সম্পর্ক

মেঘ ছিলো চতুর বিন্যাসে
বৃষ্টি হতে দেয়নি আকাশ
মাটি জানে —
আকাশের সঙ্গে তার
কতখানি যোগ . . .

ভালোবাসা

তোমার সঙ্গে দেখা না হ'লে
আমি হয়তো
উৎসর্গ পত্রে ভুলে যেতুম
মানুষের নাম . . .

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

এক পংক্তির দশটি

১. চড়ুই পাখিকে আজ জিরাফের মতন দেখায়
২. খোলস পুড়িয়ে দিলে বৃষ্টি হয় উঠোনে জানলায়
৩. সকল প্রবাদ লোকপ্রজ্ঞার সার
৪. যাকে পেলে মৃগয়ায় সে কখনো ছিল না তোমার
৫. খিড়কি আদর করে দরজা শুধু অপমান করে
৬. ভূমিপুত্র ভূমির মালিক নয় কোনোদিন
৭. সময় হঠাৎ এসে শরীরের মায়া খুলে নেয়
৮. মার মুখ চিরকাল উদ্বেগের নক্সা এঁকে রাখে
৯. কবিতার সন্ধ্যাক্ষর কুয়াশা নারীর মত আবদ্ধ মনে হয়
১০. বৃদ্ধ দিন স্মৃতিক্ষণ পরিশোধ করে

মঞ্জুভাষ মিত্র

বই

এই পৃথিবীতে মাত্র একটি বই আছে
সেই বইএর মাত্র দুটি পাতা
মাটি ও আকাশ
সে বই বারবার পড়তে হয়
সে বই পড়া কখনো ফুরোয় না

মল্লিকা সেনগুপ্ত

বাংলা

আমার নাম বাংলাভাষা
ভারতবর্ষ ঘর
চিরদিনের দুয়োরানী
তবুও করি ঘর।

মধুরা মিত্র

মন

একটা মনের মধ্যে মনটাকে আবদ্ধ রেখেছিল মেয়ে
মনের মধ্যে হাতরে হাতরে খুঁজেছিল নিজের মন।
পেয়েছিল অতৃপ্তি এবং অপমান
বুঝেছিল সময় গড়িয়ে গেছে হাওয়ায় হাওয়ায়
বিষণ্ণ মন মেয়েটিকে নদীর খবর দিল।

খরচ

প্রতিদিন খরচ হয়ে যাচ্ছে আয়ু
খরচ করছি, ইচ্ছে অনিচ্ছে, ভালোবাসা
কাম-ক্রোধ, আশা-আনন্দ,
খরচ করতে পারছিনা শুধু বিষাদ।

মঞ্জুর রহমান বাবু (বাংলাদেশ)

তুমি সিরিজ

এক

□

তুমি আছো বলেই এই আমার পাথর প্রতিমা
ভেতরে শূন্যতা রেখে
বাইরে স্বপ্নের ঘর পূর্ণ করি
আমি অন্য কোথাও যাবো না
যেখানে তোমার একটুকরো চিহ্ন নেই ?

দুই

□

এবার আষাঢ়ে বৃষ্টি নামেনি
ভাদ্রবের মেঘে অবাধ বৃষ্টি ভেসে এসে
স্মৃতির পৃথিবীতে ভেজানো তোমার শরীর।

জলছবি (তিন) □

সময়ের গ্রস্ত বুকে তোমার ছবি
রাত নয় ! দিনের আলোয় প্রতিবিম্ব শক্ত মাটিতে;
হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি তৃষ্ণার সলাজ-আত্মা
চৈত্রের দুপুরে চোখ ঘুমিয়ে কাঁদে ।

চার □

তুমি সম্মুখে এসে দাঁড়াতে
রঙিন স্বপ্নগুলো বাস্তবে দেখি
কাঁচের যুবতী ফ্রেমে বাঁধা নীলাক্ত জলছবি।

চিঠি (পাঁচ) □

চিঠি লিখতে চেয়ে বারবার ভুলে যাও —
আমিও ব্যস্ত ! শ্রমে আর সংসারে,
এখানে থেকে যায় না দেখা
তবু-বিশ্বাসে মন খুলে দুপুরের রৌদ্রে পোড়ে
দ্রুতগামী সময়ের স্রোতে গড়া সম্পর্ক।
যন্ত্রনার রঙে ভিজে চিঠি লিখো —
সময়ে পা রেখে প্রস্তর পার্বন পাঠে।

মঞ্জু বালা

অণুগুচ্ছ

□

শৈশব ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে
নীরবে অস্তাচলে
দুঃখের ওপালে সুখ
বেদনায় হাসে।

□

ভোরের আকাশে আজ
কুয়াশায় বাড়িয়েছে হাত
অন্ধকারে মিশেছে বারুদ

□

বিশ্বাস আর অবিশ্বাস যেন
সুখ-দুঃখের এই অদ্ভুত ছায়াঘরে

□

মানুষ নিজেকে বড় ভালবাসে
তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখে
নিজেরই মুখ শুধু।

মনিরা খাতুন

নিঃশব্দে

নিঃশব্দে অনুভূতির দেওয়াল ভেঙে ভেঙে
একটি শব্দের আতঙ্কে বুকটা কাঁপতে থাকে।
একটি সময়ে আবার মন স্থির হয়
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি সুন্দর পৃথিবীর দিকে।

মিহির সরকার

হয়েছে কিছু

সবুজ মাঠ বলেছিল —
আমরা করব জয়
পায়ে পায়ে ক্ষোভ কেন
সেখানে জড়ো হয় ?
ভুল কিছু হয়েছে নিশ্চয়।

ক্ষমা কর
ক্ষমা কর সবুজ পাতা
এত রোদ আমার নয়
ক্ষমা কর;
দিন আনা দিন খাওয়া
ছড়ানো ছিটানো এত রক্ত
যদি তোমাদের হয়।

বৃষ্টি

বৃষ্টি আদিম এবং অক্ষুব্ধ
ভালোবাসে শুধু এই গ্রহকেই।
তুমি বৃষ্টি হও এই মরুতমে
আমি খা-খা গ্রহ হয়ে শুয়ে থাকব
হাভাতে পোশাকে নীল কুয়াশায়।

মৃণাল চক্রবর্তী

সে

তাসের খেলায় বিভোর এখন সে
এতটাই যে
অবাক খুনী তাকিয়ে থাকে তার মুখে

জলের বুকে
পা রেখে সে দাঁড়িয়ে এখন একা
চারপাশে তার রক্তের মুখোশ হাসে —

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

মুক্তি

পাখি উড়ে গেলে বৃক্ষের ডাল থেকে আকাশে পাখির
গান বাজে
গানে গানে মুক্তির সঙ্গীত ঢেউ তুলে।
এ মুক্তি আমার, এ মুক্তি সবার
মুক্তির সোপান তলে জীবনের নিত্য সারাৎসার।

সৃষ্টি ও সংহার

আগুনে গড়েছি এক উজ্জ্বল প্রতিমা ...
আগুনের নারী, নৃত্যময়ী নদীটির ঢেউ
হাতে লুকে নেয় শুরু হয় বসন্ত বাহার।
আগুনকে ভালবেসে রমণীর রমণীর প্রেমে
খুঁজে পাই সৃষ্টি ও সংহার।

মোহাঃ সাদউদ্দিন

আমাদের ভীতি

সর্বের ভেতর ভূত, সেও নাগালে পাওয়া যায়
জাতসর্প ? সেও পরম বন্ধু হয়।
ভীষণ ও ভয়ঙ্কর হৃদয়ের ভেতরের
জানোয়ার কিংবা শয়তানটা ?

রবীন্দ্রনাথ পাত্তে

প্রাত্যহিকী

এইভাবে অসম্ভব প্রাণায়াম স্তব্ধ বিকেল ফেলে রাত
ঘুরোলে আমার নিঃস্বপ্ন যৌগিক ঘুম ভাঙার চাদর
বদলানো করুণ ভোরাই কথাছিল এইসব অভ্যুত্থান দিগন্ত
তৃষ্ণা অনিরুদ্ধ ভূগোল আচমকা ঢেলে দেবে তৃতীয়
বিষাদ। আর আমিও ভেজা ভেজা মেঘে ডানা ছড়িয়ে
দুপুরালি জটিল জৈবিক।

রফিক-উল-ইসলাম

নূপুর

অসম্ভব সেই রাত্রি। নোঙর তুলে দিলুম। আবহমান দুলে
উঠলো কুয়াশার ভেতর। নক্ষত্রপথ পেরিয়ে লাফিয়ে
উঠছে জোড়া নূপুর। পা বাড়ালেই পৃথিবী গড়িয়ে যাবে।
আমরা জ্বলছি। উল্কার টুকরোগুলো ছড়াতে ছড়াতে শুরুর
দিকে ফিরছি।

পাখি

এখানে বর্ণময় পাখিরা আসে। আমরা এসেছি। আমাদের
শীতকাতরতা, ভুল বৃষ্টিতে ভেজা শ্রাবণ, আমাদের রঙিন
পালক ছায়াপথে ছড়িয়ে দেবো। শরীর ভেঙে পাথরখণ্ড
কুড়িয়ে নিয়ে গেলো শ্রমিক মৌমাছিরা। এবার ভারহীন
কোন শোকগাথার ভেতর নির্বাসিত আমরা।
ফেরার পথটি হাওয়ায় মুছে দাও।

রমেশ পুরকায়স্থ

ধারাবিবরণী

ঝড় এসে নিমেষে উড়িয়ে দেয় সমস্ত স্মরণসভা
বস্তুত গাছের থেকে এতো পাতা ঝরেছে সেদিন
ঠিক সে-রকম দুরন্ত বৃষ্টির পরে বৈশাখী মেঘের
ফাঁকে ঝরে পড়ে রোদ্দুরের স্মৃতি
হলুদ পৃষ্ঠায় তার লেখা যায় একশোটি ধারাবিবরণী।

অপেক্ষা

কেউ কেউ বসে থাকে
জ্যোৎস্নার সিঁড়ি বেয়ে রাত
নেমে আসে নির্জন উঠোনে
শিরীষ ফুলের গন্ধে নিদ্রাহীন ঘাটের সোপান
কেউ কেউ বসে থাকে
রোদ্দুরে গড়িয়ে যায় জ্যোৎস্নার সিঁড়ি।

রফিক আলম

নাচঘর

চলে এসেছি পথভেঙে
গ্রন্থিমোচন জন্ম স্মৃতি, নরমমাটি বুক।
ঠিকানার লাগাম ধরে
ডাক পিওন দিয়ে যায়, গুচ্ছ বেপথু চিঠি।
মনে পড়ে কতকথা, কফিনে ঢাকা ভালোবাসা,
পাথর চাপা কপাল, নাচঘর এবং উর্বশী।

মস্করা

নদী কূল ছুঁয়ে নেমে যায়
ফাজিল ঢেউ,
এই আমার তেপায়া ভবিষ্যৎ।
মাস্তুলে ওড়াই সংকেত
হাল ভাঙা নৌকা
অনিশ্চিতে ভেলা চলে কাপালিক স্রোতে।

রঞ্জিত রায়চৌধুরী

প্রিয়তমা বলবো বলো
তোমার কাছে চাইতে পারে ক্ষমা
এমন সাহস, আর কজনার আছে।
ত্রিলোত্তমা বলার অপরাধে
মিলতে পারে কঠিনতম সাজা,
শোনার পরে, প্রিয়তমা, বলবো বলে,
অধীর হয়ে আছি।

এক জীবনের মতো
যে কটি ফুলের নাম ধরে তুমি বৃক্ষদের,
জীবন চরিত জেনেছিলে,
আজ বহুকাল হ'ল - সেই সব ফুল এবং বৃক্ষ দিল,
দৃশ্য থেকে দূরে, বহুদূরে কেবল শব্দের মাঝে
এক জীবনের মতো, পরবাসী।

রামরতন মুখোপাধ্যায়

ছাই
যেখান থেকে আসি আবার
সেখানেই ফিরে যাই
জোয়ারের মত জল
আর আগুন পারা ক্রোধ
নামতে নামতে ছাই

কল্লোলরর
সৌধের পিছনে পড়েছে ছায়া
চতুর্দশী চাঁদ ম্লানোজ্জ্বল
এই ছায়া গাঢ় অপলক
লাহেন শা ঘুমোয়নি এখনও ?
তাজের শরীরে হাগে কল্লোলরব ...

রেখা দত্ত

এক
শ্রেণীর কাঁটাতারে, ঘেরা থাকে কবির জীবন,
সব বিনিময়ে চায় মানুষের মন,
দেয়া নেয়া শেষে দেখে সৌধ চোরাবালি,
জীবনের তহবিল পড়ে থাকে খালি

দুই
আসল নকল চিনিস নারে ভুলে
জীবনটা তাই নকল দিয়ে ঘেরা,
হীরা ভেবে-কাঁচের টুকরো তুলে
তুই যে শুধু করিস ঘোরাফেরা।

শতরূপা সান্যাল

এক
দু-চোখে দিয়েছ তুলি এঁটে
ঘিরেছ অযুত আরাগার
আত্মতৃপ্তি পাচ্ছ এই ভেবে
দৃষ্টি রুখে দিয়েছ আমার ।

দুই
মায়ের বুকের ভিতর
ঘুমোয় জন্মদিন
বিদেশে প্রবাসী ছেলে
পায় কি তার গ্রীটিং ।

তিন
আহা আমার সোনার বাংলা
সোনার হাটে সোনা
বাংলা আছে বোতল ভরা
বালতি ভুবে চোনা।

শঙ্কর বসু

এক
নদীর বুকে হাত রাখি, প্রশ্ন করি 'কেমন আছ ?'
আমার ছায়ার সঙ্গে খেলতে খেলতে
নারীর চোখে জল আসে
হয়তো আরও একটু গভীরে ওর স্পন্দন শুনতে পাব এ
কেমন বোধ ?

দুই
ভালবাসা মৃত্যুর কথা ভাবায়
ভালবাসা বড় মানুষকে কাঁদায়
তবু, ভালবাসা চাই প্রতি আঁজলায়।

তিন
লাগামে টান লেগেছে এগিয়ে চল
থাক না হেনার গন্ধ নাভিমূলে
কে খোঁজ রাখে তার ?

চার
দুনিয়া বেঁধেছে তোমার সেলফোন
বাঁধতে পেরেচ কি গৃহিনীর মন ?

পাঁচ
প্রেম ও লাঙলের বেশে
ভেসে আসা নিদ্রাহীন রাত
সুরা ও বরফে মেশে
তবু, সাত বাই পাঁচে
রমণী চুলের বাঁধ ভাঙে আশ্বাসে।

শান্তি রায়

সাঁকো
একটা নিমগাছ ফুলন্ত বর্ষালি মেঘের প্রণয় সুঠাম হাওয়ার
আদর ... গোলাপেরই মতো।
স্বজন-হারানো দুঃখ এলোমেলো রমণীর বুক
আহা, চুলের বাহার ... ।
যুবতী রমণী ও নিমগাছ সাঁকো :
বুনো প্রণয়ের অবাধ্য ঝর্না
খিলখিল হাসির গমক ... ।

শিশির সামন্ত

শেষ প্রস্থান
আর কোন প্রশ্বাস নেই নিরাময়ে; নৈরাশ্য শব্দের মতো
প্রতিবন্ধী ক্রমশঃ লাঠি ঠুকে ঠুকে অন্ধতার চেয়ে তীব্র
কোন কৃষ্ণবর্ণ দিনে পৌঁছে যায়। এরপর জলকল্লোলে এ
মুখমণ্ডল ভিজে, বাঁচার প্রয়াস আর নেই, কিভাবে বাঁচবে
এই মানুষ;ভয়ংকর পিঙ্গল দুর্দিন ছেয়েছে।

নীলিমা দিন
কাল ছিলো ব্রহ্মদিন, নির্বসনা দিনের সকালের রৌদ্র
চুম্বনের লাল ওষ্ঠ জুড়ে যে বর্নাঢ্য, রক্ষণশীলতা
সহস্রদলের মতো খুলে গেলো, আর তখন কেউ বল্গা
ধরে চালায় উচ্চৈশ্রবা, নিবিড় তাহাকে ব্রহ্মদিনে আমাকে
পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো নীলিমা দিনের কাছাকাছি।

শিবদাস চট্টোপাধ্যায়

তুমি কত সুন্দর
গন্ধ বাড়ির পাশে ফেরি বাড়ির
বাতাস আর অবাক আকাশ
অপাবৃত অপনোদনে বসন্ত বাহার :
গন্ধ বাড়ির পাশে ফেরি বাড়ির
সুর আর সুর বাহারে আলো সংকাশ ।

যখন কিনিনু পাখিনাম
শেষের মলাটে আরও আরও মুখ ... রঙ্ ওল্টালেও স্পষ্ট
হয় সূচনা পর্বের অভিলেখ ... এভাবেই মুঠোয় এসে

যায় সমস্ত বিস্ময় ...
ভস্মমুখে ওড়া পাখির আকাশ রচনায়,
ফিনিক্স যার পাখিনাম।

শিপ্রা সেনধর

সূর্যমুখী □

. . তবু
তবু আমি সূর্যমুখী

অপার তৃষ্ণা বুকে
নক্ষত্র স্বাতীটির দিকে
চাতক যেমন . . .

ন যযৌ ন তস্থৌ □

ময়ূরপুচ্ছ প'রে
নিত্য তাড়া খাওয়া
কাক আর ময়ূরের

কোথায় দাঁড়াবে বলো
মানুষ এখন ?

সমরেন্দ্র মণ্ডল

মাটি

মাটি ডাকলেই হৃদয় ফুটিফাটা
মাটি ডাকলেই শীতপাতা উড়ে যায়
কুয়াশা ছিঁড়ে হিমেল বাতাস
কী ভীষণ গন্ধ এনে দেয় !

সন্দীপ কুমার

অণুগুচ্ছ

এক

পণ্ডরা সরাসরি উলঙ্গ থাকে
আমরা তলায় তলায় তার তিনগুণ

দুই

ফুল পাখি এরাও প্রেম করে,
কিন্তু মানুষের প্রেমে এত এত
উপন্যাস-কবিতা জন্মায়
মানুষের প্রেম সহজাত নয়।।

তিন

গাছ যখন
তখনই সুন্দর,
তলায়
পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়।।

সনৎকুমার মণ্ডল

অগ্রগমন

এক পা দু'পা ক'রে এগোতে এগোতে
কখন এসে পড়েছি
একেবারে সূর্যের কাছাকাছি
এখন আর পিছোনোর উপায় নেই;
এগোতে পারা যাবে,
পিছানো যাবে না কোনভাবেই।

সনৎকুমার মিত্র

দুটি কবিতা

□

জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে বুঝলাম
আগুনে আগুন নেভে
ঝড়ের পরে জ্বর ছেড়ে যায়
পৃথিবীকে মনে হয় স্বর্গের চেয়ে প্রিয়

□

জীবনকে জড়িয়ে আছে তৃষ্ণা
জীবন জীবনের মাঝে
সুধার সন্ধান করে
এবং পেলেই স্বর্গ ধরা দেয় হাতের মুঠোয়

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

অনুবাদ কবিতা

এক

তলোয়ার দিয়ে জল কেটে দাও
জল ভেসে যায় দ্বিগুণ জোরে
মদের গেলাসে দুঃখ ডোবাও
দুঃখ আবার উথলে পড়ে।

দুই

আমি এক মুঠো ছাই দিয়ে মেখেছি
এক ইঞ্চি ভালবাসা।

সুষমা বসু

এক

শুধু কানে শুনি, মনে না —
তাই মনে কিছু থাকে না।

দুই

জীবনে যে সব, অন্তিমে সে-ই শব।
তবু সুখের আশায় ভোগের কাদায়
চিহ্ন রাখি খ্যাতির খাতায়।

তিন

পথিকের শিলা, সাধকের শালগ্রাম,
বিধবীর পুতলাম।

চার

নগদ-পাওয়ার লোভে, পরম-পাওয়া করি হেলা,
পুরনো-কথার সাজ প'রে
বহু-কথার হাটের মেলায়
গায়ে জড়াই সঙের কাঁথা।

পাঁচ

অনর্গল মুখরতায় গভীর নিঃসঙ্গতা,
অন্তরে অঝোর-ক্রন্দন, তবু শুষ্ক-নয়ন।

সুজাতা বিশ্বাস

এক

অর্ধেক বিবস শীতে বাকিটা হিসিতে ভিজে মা হাসে বর্ষার
নাকানি উনুনে জমা ভাত জল দেয় উচ্ছলতায় আমাদের
ভালোবাসা। ত্রুটি হলে অগ্নিপিতার মুঠোয় উপোষিতা
মা। অনেক দূরে এসে যাকে ভুলে গেছি, পিছু ফিরে দেখি
রোদ বৃষ্টির আগুনে পোড়ায় মা-র ভালোবাসা।

দুই

চলেনা দিন, বইয়ের তেমন ব্যবসায়ী নই
পটাতে দুরন্ত, জরুরী নই, সেজেছি হীরক
চিনে নিতে। হীরকের কাছে এসে থমকে দাঁড়াই
—আমিতো মেধাহীন কাঁচ
ও যদি আমাকে চলতে, বলতে আসতে যেতে
সাইজ করে কাটে।

তিন

এসব থামাও, কে তুমি কীর্তিমান
সাধ মেটাবো, আমার গাঢ় রক্তে দেবো অঞ্জলি,
চিরসত্য মৃত্যু জানি, তবু বন্ধ করো
ফুটন্ত কুঁড়ির রক্তে তোমার নগ্ন স্নান

চার

আমি যদি তোমার উষা,
কি করে নিশুতি রাতে ডাকবে ঝিঁঝি
জোনাকি আলোয়,
বুদ্ধের সিদ্ধি লাভে পরমাণে
এযুগে তবে কে হবে সুজাতা ?

সুনির্মল কুন্ডু

উন্মুখ প্রবাস

এসেছে গন্ধদি ফের মুখার প্রাচীরে
এবং ছুটেছে উগ্র দিগন্ত তিমিরে;

তৃণাসক্ত তাদের মেনেছি
স্বপ্ন শেষে, স্বপ্নেই জেনেছি
ঘাস কিন্তু বেঁচে যাবে যদি বৃষ্টি আসে
আশ্বিনের উন্মুখ প্রবাসে।

সময় সংগত
বহুদিনই একতাল সোনার পোশাক
প'রেছিল উৎসবের জমাট মেলায়,
বহুদিনই এতকাল ছিল চক্রবাক
প্রার্থনার দিঘিজলে মুখ্যতঃ খেলায়;
জলেই আগুন নিভে সময় সংগত
প্রতিরোধে প্রতিবাদে উড়ো অভ্যাগত !

ডাঃ সুভাষ মুখার্জী

মিছিল
কর্মহীন মানুষের বর্দ্ধমান মিছিল
মুখে বাণী আশার, চোখে অমিল
চাপা হতাশা, ক্লিষ্ট মানুষের মুখ শুধু দেখে যাই,
চলে তারা দলে দলে, তবু জানে এ চলা বৃথাই।

সোমেন পাল

মৃত্যু নেই
সে চলে গেল, কোন কথা বলে গেল না।
একদিকে অমাবস্যার রাত,
অন্যদিকে রোদ্দুর ঝলমলে সকাল।
জীবনের আশা আকাঙ্খা দোদুল্যমান।
কেউ কারও অপেক্ষায় থাকে না।
তবুও ভালবাসা জেগে থাকে।
শত আঘাতেই তার মৃত্যু হয় না।

স্বপন শর্মা

স্বপ্ন ও সিঁড়ি
স্বপ্নের গোলাপ বুকে হতবাক চলা
ভানে বাঁয়ে বহুত চেনা সিঁড়ি —
পেছল রক্তাক্ত,
নিজস্ব চূড়ায় তার পাশ দিয়ে হাঁটা।

ঝরা জর্জরিত হাত
ঝরাপাতার কাছে যতটুকু তাপ, লুটে নিতে চায় কামুক হাত। মুমূর্ষু সবুজ, তবু তার কাছে, যে কামুক হাতের জন্য শাল তমালের এলিট পাতারা তাপ নিয়ে অপেক্ষায়, সে হাত কেন ঝরাপাতার কাছে ?

স্বপন নন্দী

পাথর
এক
তার চোখে জল দেখিনি কখনো
অভিমানে কখনো চিবুক কাঁপে না তার
মানবিক ক্ষত যে বুনে রাখে বুকে
তার কেন নীরব আকৃতি
আহুতির এমন বিনত মুদ্রা ।

দুই
কবি তাঁর শরীরে খোদাই করেন প্রশস্তি-পয়ার, মন্ত্রী থেকে আমলা স্থূল হরফে মুদ্রিত করেন তাঁদের কীর্তি
এইভাবে সন্ধ্যাভাষায় এই সময়ের চর্যাপদ লজ্জার মহাভারত।

তিন
একা নয়, একক যাপিত জীবনে
দুটি করতল পেতে ধরে রাখে প্রশস্তিকা
সমস্ত শরীর ভরে যায় অন্যকথায়
পাথরের এপিটাফ কোথায় লিপিত হবে ।

প্রসঙ্গ ঃ কবিতার সমালোচনা

অশোক রায়চৌধুরী

কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত সমালোচক ডঃ কেন জনসন-এর প্রবাদপ্রতিম উক্তিটি মনে পড়ে To judge a poem is the faculty of a poet, not all but the best. আজকাল প্রায় প্রতিটি সাহিত্যানুষ্ঠানে কবিতার সমালোচনার রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে। বিশেষ করে 'কফি হাউস' পত্রিকায়। যেন সমালোচনা একটা খুবই সহজ বস্তু। গড়গড়িয়ে মুখ দিয়ে বললাম আর অমনি সমালোচনা হয়ে গেল। কবিতার সমালোচনা মানে কবিতার ব্যাখ্যা নয়। কবিতার ঐশ্বর্য ও দুর্বলতা, তার আঙ্গিক ও ব্যঞ্জনা, তার বাকশৈলী ও অভিনবত্ব—এ বিষয়গুলোকে পাঠকের সামনে মেলে ধরাই সমালোচকের কাজ। কবিতা নানা ধরণের হয়, নানান গঠন-শৈলীর। নানান রীতির। কোনো কবিতা Direct approach বা সোজাসুজি লেখা হয়। তাতে থাকে না কোনো রূপক-অলংকার অথবা পরোক্ষভাবিতা। এও এক ধরনের আধুনিক কবিতা। আবার কোনো কোনো কবিতার পরোক্ষভাবিতা বা Indirect Method-রূপক, চিত্রকল্প এবং ব্যঞ্জনার প্রসাধনে গড়ে তোলা হয় সেই কবিতার শরীর ও আত্মা। সেই সব কবিতা উত্তরিত হয় বচন থেকে বচনাতীতে। এ ধরণের কবিতা হৃদয়কে চট্‌করে দোলা দেয় না। কবিতা শোনার পর হাততালি বা মুখ থেকে 'বাঃ' শব্দটি বেরোয় না। এ কবিতা পাঠের পর অনেকক্ষণ তার প্রতিক্রিয়া মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে অনুরণিত হতে থাকে। তবে সেই সব কবিতাই অমোঘ ও অমর হয়ে থাকে যার মধ্যে থেকে ভাব্য-ভাবনা আলো আঁধারি, বহুমাত্রিকতা, বহুকৌনিকতা এবং দ্যুতাত্রোহ ঘূর্ণাবর্ত। কিন্তু সেরকম কবিতা তো লাখে একটাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোনো কবিতা প্রত্যক্ষভাবী। কোনোটা পরোক্ষভাবী। কোনোটা বিবৃতিধর্মী। আবার কোনোটা বা সাংকেতিক বা Symbolic. কোনো কবিতার ভাব বস্তু থাকে আবৃত (covert)। কোনোটা বা অনাবৃত (overt) কোনো কবিতার শরীর বহির্বয়নে গড়ে ওঠে। আবার কোনো কবিতার আত্মা গড়ে ওঠে অন্তর্বয়নে সেগুলো যতখানি না আবৃত্তিযোগ্য তার চেয়ে বেশী নিভৃতে একাকী পাঠযোগ্য। সুতরাং একটি কবিতা সমালোচনা করতে গেলে এগুলো মাথায় রেখে কবিতাটি কোন ধরণের সেটা বোঝা প্রয়োজন। কবিতার ধারণার স্তর (Ideational level) তার ঘন-শিথিলতা (Condensity) তার fusion, mode এবং media জানা প্রয়োজন। শিল্পী যখন ছবি আঁকেন তার আগে তিনি মনে মনে স্থির করে নেন কোন মিডিয়াতে তিনি ছবি আঁকবেন। জলরঙে ? না তেলরঙে ? না প্যাস্টেলে ? ছন্দে লেখা হলে অক্ষরবৃত্তে ? না মাত্রাবৃত্তে ? না স্বরবৃত্তে ? নাকি মুক্তক ছন্দে ? না গদ্য বাহনে ? ছন্দে লেখা কবিতা তার মাত্রাসমতা, পর্বসন্ধিতি, পদসাম্যতা তার মিলগত ও ধ্বনিগত সাম্যতা রাখতে পেরেছে কিনা অর্থালংকারগত অনুপপত্তি Metonymical (fallacy) ঘটেছে কিনা। কোনো কোনো সময় কবিতায় ইচ্ছে করেই মাত্রার হেরফের ঘটানো হয়, কখনও কবিতার চরণ সৈর্ঘ্যে বাড়ে, কমে। কখনও অতিপর্ব যোজনা করা হয়। এক ছন্দের মধ্যে আরেক ছন্দের অনুপ্রবেশ (Interpolation) বা ছন্দের মিশ্রণ (Admixture) ঘটানো হয়। কোনো কোনো সময় ছন্দের নিগড় ভেঙে দিয়ে তার মধ্যে গদ্যধর্মিতা আনা হয়। কোন কোন সময় ছন্দ থেকে গদ্যে অথবা গদ্য থেকে ছন্দে Frequentation ঘটানো হয়। আধুনিক কবিতায় কখনো,

কথ্যভাষিতা (Colloquialism) কখনও কখনও প্রচলিত শব্দের সঙ্গে ও অপ্রচলিত শব্দ মিশিয়ে অভিনব চিত্র-কল্প বা শব্দকল্প (coinage) তৈরী করা হয়। কখনো চলিত শব্দের সঙ্গে সাধু শব্দ জুড়ে দিয়ে, কখনো কাঁড়া শব্দের সঙ্গে আকাঁড়া শব্দ (dialect) জুড়ে কবিতায় অভিনবত্ব আনা হয়। একজন দক্ষ কাব্য সমালোচককে এই সব বিষয় জানতে হবে। না হলে তার সমালোচনা হয়ে পড়বে দায়সারা, অপরিণত। কোন সমালোচকেরই কবির ব্যক্তিগত পরিচয়, পদাধিকার, বা তার সামাজিক পদ মর্যাদা দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনে তাকে থাকতে হবে লোকালয় থেকে অজ্ঞাতবাসে। সমালোচকের কাছে সমস্ত কবিই হবে তাঁর প্রতিপক্ষ। কবিতার উজ্জ্বলতার বা সৌন্দর্যটুকু তাকে যেমন সহৃদয়তার সঙ্গে দেখাতে হবে, তেমনি কবিতার ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলোকে সার্চ লাইটের আলো ফেলে বা ময়না তদন্তের মত কেটে ছিঁড়ে ফেড়ে নির্মমভাবে দেখাতে হবে। যদিও তেমন সমালোচক ফিনিক্স্ পাখির মতই দুর্লভ।

অনেকে আমার বক্তব্যে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। তারা বলতে পারেন, কবিতার সমালোচক মাত্রই যে বড় কবি হবেন তার কি মানে আছে ? যেমন ফুটবল বা ক্রিকেট খেলায় রেফারি কিংবা আম্পায়ারকে সব সময় যে ভাল ফুটবলার বা ক্রিকেটার হতেই হবে তার কি কোনো মানে আছে ? হ্যাঁ রেফারি কিংবা আম্পায়ার খেলার নিয়মকানুন জানেন, কিন্তু খেলার শিল্প ও টেক্‌নিক জানেন না, যদি না তিনি ভাল খেলোয়াড় হন। একটি ফুটবলকে কিভাবে dribble ও dodge করে পায়ের বা হাঁটুর শিল্পে প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে, সুইং করিয়ে গোলে পাঠাতে হয়, কিভাবে chip করে হাফ্‌ভলি বা ব্যাকভলির সাহায্যে লক্ষ্যস্থলে পাঠাতে হয়, তা শুধু খেলোয়াড়ই জানেন।

ঘন্টায় ১৫০ কি.মি. বেগে ছুটে আসা একটা আগুনের গোলার মত বলকে কিভাবে ব্যাটসম্যান ভঙ্গির মোচড়ে পত্রপাঠ সীমানার বাইরে পাঠান। কিভাবে একটা on-এর বলকে পুল করে long off-এ পাঠানো হয়, তা একমাত্র খেলোয়াড়-ই জানেন। এসব শিল্পকলা রেফারি বা আম্পায়ারের স্বপ্নেরও বাইরে।

তবে সব কথার শেষ কথা হল কবিতার আত্মাকে কোনো সমালোচকই সমালোচনায় সঠিক ধরতে পারেন না। কারণ কবিতা নামের নারীটি সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ব্যাখ্যা নয়। বিশ্লেষণ নয়। একান্ত নিবিড় অনুভবেই তার সৌন্দর্য ও রস উপভোগ করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রফেসর লুইস্ টুরকোর একটি ফিরিস্তি দাখিল করছি কবিতার আলোচকদের শিক্ষার জন্য। কবিতার সমালোচকদের যা যা জানা দরকার :

Typographical level of poetry

A. Mode
   (i) Prose
   (ii) Verse

B. Proportion in figure
   (i) Strophe
   (ii) Stanza

Sonic level

A. General prosody
   (i) Accentual/Podic
   (ii) Syllabic
   (iii) Accentual syllabic
   (iv) Isoverbal word count
   (v) Grammatic parallelism
   (vi) Inventive Prosodies/ Moraics

Specific Prosody

A. Narrative
B. Quantitative
C. Verbal

Meter (Iambic, Trochee, Penta-meter, Tetrameter, Tetrapodic, Hexameter, Octosyllabic etc.

Propation in measure differing line-length

Proportion in Rhyme (Rhyme scheme, refrain, metrical variation)

A. Genergal form (ode, Elegy, Lyric)
B. Specific (Sonnet, Villanelle, Nonsense verse).

Other sonic devices (consonance, assonance, Alliteration)

Sensory level Trophes.
(a) Description
(b) Similes
(c) Metaphores
(d) Rhetorical trophes

10. Usages and tradition of figures (Imagist, Surrealist, Hungrealist Metaphorical, Symbolist, Futurist etc.)

সুতরাং কবি মলয় রায়চৌধুরীর গলায় গলা মিলিয়ে বলছি—পাঁচ দশ লাইনের মধ্যে একটি কাব্যগ্রন্থ বা কবিতার সমালোচনা, জিনিসটা গণ্ডমূর্খতার চেয়েও ঢের বড়। তাই কফি হাউস পত্রিকায় সমালোচনার পরিবর্তে সম্প্রতি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হচ্ছে। কোনো কবি বা লেখককে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আঘাত করা বা তোয়াই দেবার জন্য নয়, পাঠক ও লেখকদের মনে মুদ্রিত লেখাগুলো সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই। তবে কফি হাউস খারাপকে খারাপ, ভালোকে ভালো বলতে ভয় পায়না — It always calls spade a spade.

●●●●●●●●●●●●●●

[নিবন্ধটি অণু-নিবন্ধ হয়ে উঠলোনা, কারণ কফি হাউস-এর বহু পাঠক, কবি কবিতার সমালোচনা ব্যাপারটা সবিস্তারে জানতে চেয়েছিলেন, তাই সবিস্তারে জানানো হল।]

সম্পাদক কফি হাউস

শিক্ষায় ইংরেজির গুরুত্ব অসীম

অমিত কাশ্যপ

ব্যক্তিস্বাধীনতার বাসে 'লেডিজ সিট' লেখার পরিবর্তে কবে থেকে ব্যাপকভাবে 'মহিলা সংরক্ষিত' কথাটি লেখা হবে ! কবে থেকে সাদা জামার ওপর কালো কোট পরে 'ইয়োর অনার' না বলে 'মাননীয় মহোদয়' বলব। কবে থেকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাট, শট, লং শট, ক্লোজ আপ, ক্লাপস্টিক বলা বন্ধ হবে ! আদৌ এই চলতি ইংরেজি শব্দ বন্ধ করা সম্ভব হবে কিনা কে জানে ! তবে সম্প্রতি সরকার একটা প্রচেষ্টা নিয়েছে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া আর সরকারি বেসরকারি, আধাসরকারি— সব মহলেই বাংলা ভাষায় কাজকর্ম করা নিয়ে। এটা নিশ্চয়ই সুখের এবং পরিতাপের যে মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বলে ক'য়ে ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ অনেক পরে স্বাধীনতার স্বাদ

পেরেও আজ পৃথিবীর ১৭৪টি স্বাধীন দেশের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা বাংলা নিয়ে গর্বিত। আমরা কি সেই গর্ব অনুভব করতে পারব। বিশ্বায়নের পথে সারা বিশ্ব যখন পা বাড়িয়েছে তখন 'মাতৃভাষা, মাতৃভাষা' বলে সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার কোনও মানে হয়।

ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগে এটাই একটা মাধ্যম বলা যায়। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে, বাস্তবতার যুগে কম্পিউটার, ইন্টারনেট যখন সারা বিশ্বকে এক মুহূর্তে হাতের মধ্যে হাজির করছে তখন ইংরেজি ভাষাকে অস্বীকার করি কোন অজুহাতে। মাতৃভাষার স্বাদ নেওয়ার গর্ব একটা থাকে ঠিক কথা। কিন্তু সেভাবে মাতৃভাষার মূল্যায়ন হচ্ছে কি। উচ্চশিক্ষার জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে দ্বারস্থ হতে হচ্ছে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ভাষা ইংরেজির। বিদেশযাত্রার প্রাক্‌কালে শিখে নিতে হচ্ছে এই প্রথম শ্রেণীর ভাষাটিকে। মাতৃভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে যাঁরা সোচ্চার হয়ে জগদীশ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদনের নাম করেন, তাঁরা ভুলে যান এনাদেরও এই বিদেশী ভাষার প্রতি ব্যুৎপত্তি ছিল অগাধ। এই ভাষাটিকে বর্জন করে শিক্ষার মান যে উর্দ্ধমুখী হবে না তা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি তা করে এক শিক্ষাকে সমাবেশে মইনুল হোসেন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক সমস্যার কথা উত্থাপন করতেই, ব্যারিস্টার কেবল বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা করে আপনারা পাগল হচ্ছেন। কিন্তু ইংরেজি ভাল করে না শিখলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। কথাটির গুরুত্ব অসীম। তবে ইংরেজি ভাষা শিখব বলেই মাতৃভাষা বাংলার সমস্যার কথা বলব না, বা শুনব না তা নয়। কারণ একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষা পৃথিবীর ছ'হাজার ভাষার মধ্যে প্রথম পাঁচটি ভাষার

মধ্যে একটি। প্রথম মান্দারিন চীন ভাষা। দ্বিতীয় ইংরেজি, তৃতীয় স্প্যানিশ, চতুর্থ বাংলা, পঞ্চম হিন্দী। সহজেই অনুমেয় প্রায় পঁচিশ কোটি মানুষের ভাষা বাংলা এবং তা আজ আন্তর্জাতিক ভাষা। প্রায় বারো কোটি বাংলা ভাষাভাষীর বাস প্রতিবেশী বাংলাদেশে। আর আমাদের ভারতে বাস করেন প্রায় এগারো কোটি। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বারোটি রাজ্যের মধ্যে বাংলাভাষার প্রথম স্থান ৩টি রাজ্যে, দ্বিতীয় ২টি, তৃতীয় ১টি, চতুর্থ ৫টি, পঞ্চম ১টি। সারা ভারতে দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলা, হিন্দি প্রথম এবং রাষ্ট্রভাষা।

ইংরেজি ভাষার মূল্যায়ন হয়তো এইভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু আজ স্বীকার করতে বাধা নেই যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতেই হবে, কারণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ইংরেজির অবদান অসীম। তবে বাংলা ভাষাকে সমীহ করেই বলা যায় ইংরেজি ভাষার চর্চা করেই বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রসঙ্গ ক্রমে প্রমথ চৌধুরীর একটি বক্তব্যকে তুলে ধরা যায় : ইংরেজি ভাষাকে এখন বাঙালির দ্বি-মাতৃভাষা বলা যেতে পারে। যদি না বৈয়াকরণিকেরা মাতৃ-শব্দের দ্বিত্বে আপত্তি করেন। 'বাঙলার ভবিষ্যৎ'

শিক্ষাই যদি দেশের মানের মাপকাঠি হয়, তবে কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকা ভাল নয়। শিক্ষাই পারে আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে। মানুষের উন্নয়নের মূল স্তম্ভ হল শিক্ষা। চিন্তায়-ভাবনায় জাতীয়তাবোধে শিক্ষার যথেষ্ট ভূমিকা। সেখানে আমার ভাষাটা প্রথম এবং প্রধান এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। যে-শিক্ষা আমাদের সাংস্কৃতিক বোধকে জাগ্রত করবে, বিশ্বের দরবারে হাজির করবে আমরা সেই ভাবধারাতেই পরিপুষ্ট হব।

প্রসঙ্গ সাহিত্যে নিরপেক্ষতা

কাশীনাথ ভকত

সাহিত্য জীবন দর্পণ। প্রবহমান সমাজের ছবি। জীবন ও জগতের সাথে সংগ্রাম করে, সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসে রত মানুষের সুখ দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না ও আশা আকাঙ্খার কাহিনী সাহিত্যিকের লেখনীতে ফুটে ওঠে। জীবন বা তার সমস্যা যেমন (as it is) সেইভাবেই তাকে চিত্রিত করে পাঠকের হৃদয়কে নাড়া দেওয়াই বোধ হয় সাহিত্যিকের কাজ।

আর্টস ফর আর্টস সেক্—এটাই হচ্ছে সাহিত্যে নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গী। কবি বা সাহিত্যিক তাঁর স্বাধীন মুক্ত অনুভূতিকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে বাস্তবকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরেন। তাঁরা সৃষ্টি করেন সৌন্দর্য।

কিন্তু কোনও লেখক বা শিল্পী যদি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে কোনও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমাজ জীবনের সমস্যাকে তুলে ধরে সমাজ পরিবর্তনের (বিশেষ মতবাদের ভিত্তিতে) ইঙ্গিত দিতে থাকেন, তাহলে বলা হয় সাহিত্যে নিরপেক্ষতা থাকে না। লেখনী হয়ে ওঠে বিশেষ মতবাদের বাহক।

মার্কসীয় সাহিত্য এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করে বলে — আর্টস্ ফর আর্টস্ সেক নয়, আর্টস ফর লাইফস্ সেক। জীবন ও সমাজের নেতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরে, সমাজজীবনকে শোষণমুক্ত করে গড়ে তোলার ইঙ্গিত রয়েছে মাক্সিম গোর্কির 'মাদার' গ্রন্থে, বিপ্লবী কবি সুকান্ত অথবা পাব্লোনেরুদার কবিতায় শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে জীবনের উপযোগী শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয় ইঙ্গিত রয়েছে, রয়েছে বলিষ্ট অঙ্গীকার।

এঁরা committed কবি-সাহিত্যিক। জীবনের জয়গান গেয়েছেন। বুর্জোয়া কবি সাহিত্যিকদের মত নিরপেক্ষতা আর ভাববাদী উদাসীনতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবন ও জগতকে এড়িয়ে যান নি। Non-committed বুর্জোয়া কবিরা কোনও কিছুর সাথে নিজেকে যুক্ত না করে শুধু সুন্দরের সাধনা করে গিয়েছেন। পাঠককে কল্পনার মুক্ত আকাশে উড়ে স্বপ্নের মায়াজাল সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছেন। তাই বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রীকদার্শনিক প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে কবি ও সাহিত্যিকদের আদর্শরাষ্ট্র ও বাস্তববাদী নাগরিক জীবন গড়ে তোলার প্রয়োজনে স্বপ্ন ও কল্পনার কারবারী কবিদের দেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কোন দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক, আপনারাই বলুন।

পড়ুন ! পড়ান

শঙ্কর বসু'র বিপরীতধর্মী গল্পসংকলন

'মৃগতৃষ্ণিকা' ৩৫

শঙ্কর বসু'র রোমান্টিক প্রেমের

কবিতা সংকলন

'প্রেম যে বিস্মরণে' ২৫

প্রকাশন — নিউ স্ক্রিপ্ট

প্রাপ্তিস্থান :

দত্ত বুক হাউস

পাতিরাম, কালিকা প্রেস

আমি মাতা, আমি কন্যা, আমি বধূ

নন্দিনী বসু

নারীবাদ এখন যেন আরেক অপবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেদিন নারী ছিল খাঁচার পাখি, সামাজিক নানা অত্যাচার ও বৈষম্যের শিকার, সেদিন সেই বন্দিনীকে চার দেওয়ালের বাইরে আনতে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন প্রণম্য তাঁরা মানব সভ্যতার কাছে। কিন্তু আজকের স্বাধীন, স্বয়ংসিদ্ধা, স্বপরিচিতা নারীকে যদি বলা হয় অসীম স্বাধীনতা দাবী করতে তাহলে ইতিহাসের সঙ্গে আমরা বলতে বাধ্য হব, Extreme freedom borders on anarchy. নারী পুরুষ কেউই সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারেন না। স্বাধীনতার সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ, অসীম অনন্ত ও সংজ্ঞার বাইরে। পরিবার, প্রিয়জন, সমাজ ও রাষ্ট্রর সীমার মধ্যে স্বাধীনতার সার্থকতা।

শোনা যাচ্ছে প্রায়ই যে স্বাধীনতার (নারী) প্রথম ধাপ হিসেবে গৃহবধূদের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বামী সন্তানের দেখাশোনা করা উচিৎ। এই টাকার লেনদেনই স্বাধীনতার মাপকাঠি। আমি বুঝতে অক্ষম যে গৃহের অধিকর্ত্রী হয়ে আমি কার কাছ থেকে পারিশ্রমিক দাবি করব ? স্বামী যদি স্ত্রীকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেন, কি প্রয়োজন তাঁর চোখে বলপূর্বক পরিচারিকা হিসেবে পরিচিত হবার ?

সন্তানের অসুখে মা তার সেবা করে কার কাছ থেকে আয়ার পারিশ্রমিক চাইবে ? সন্তানের পিতার কাছে নাকি নাবালক যখন সাবালক হবে তখন বৃদ্ধ মা হিসেবে দাবি করব স্নেহ ও ত্যাগের প্রত্যেক মুহূর্তের জন্য পারিশ্রমিক ?

মা ও স্ত্রী হিসেবে পারিশ্রমিক চাওয়া মানব সভ্যতার প্রথম সোপানকে লঙ্ঘন করে, আর সেই সোপানের নাম ভালোবাসা।

সাহিত্য ভাবনা

নবকুমার শীল

মানুষ যা ভাবে এবং তার ভাবনা যাতে আলোড়িত হয় তাকেই গ্রথিত করে রূপ দেয়। এই রূপ দেওয়াটা হলো সাহিত্য। সেই রূপটি মনের কাছে ধরা দেয় এবং আমাদের অতি চেনা বলে প্রতীয়মান হয়। জগতের কাছে যা সত্য তা সাহিত্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সাহিত্যকে দেশকাল পাত্রে ছোটো করিয়া দেখিলে ঠিকমতো দেখাই হয় না। সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব। "... গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব এবং সেই সভ্যতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে"।

সাহিত্যের সর্বজনীন আহ্বান বিশেষ কোন গণ্ডী বা সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কোন নীতি বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যখন সাহিত্য সৃষ্টি হয় তখন তা' সত্য থেকে দূরে সরে যায়। সাহিত্যের প্রধান গুণ তার নিজস্বতা। চিরন্তনকে প্রকাশ করা। সেই প্রকাশের মধ্যে দিয়ে চারপাশের বদ্ধতাকে মুক্তির বাণী শোনাতে

হবে। কলমের মুখে তখন অসির ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়ে সব কিছু অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। সাহিত্যের জোর সেখানেই যেখানে সে নিরপেক্ষ ও সত্যান্বেষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সমাজকে সঠিকপথে পরিচালিত করবে।

সাহিত্যের আর একটা দিক আছে তা হোলো আনন্দ দান করা। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'সে আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ নহে; তাহার জন্যও শিক্ষা এবং সাহায্যের প্রয়োজন। এই শিক্ষাটিই আমাদের অর্জন করতে হবে।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা' বলেছেন আমাদের কাছে অক্ষত সমভাবে বিক্ষোভ ও গ্রহণীয় — 'বাংলা সাহিত্য আমাদের সৃষ্টি। এমন কি, ইহা আমাদের নতুন সৃষ্টি বলিলেও হয়। অর্থাৎ ইহা আমাদের দেশের পুরাতন সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ধারা যে-খাতে বহিত বর্তমান সাহিত্য সেই খাতে বহে না। আমাদের দেশের অধিকাংশে আচার-বিচার পুরাতনের নির্জীব পুনরাবৃত্তি। কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে আপন যোগসাধনে প্রবৃত্ত।'

বাঙালী জীবনের সঙ্গে সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চেতনা ও বোধের উন্মেষের সঙ্গে স্নায়ুর সূক্ষ্ম অনুভূতিতে তা' অনুরনিত হয়। যা' সুন্দর তা বিকশিত হয় ভাবনার আহরিত সম্পদে। চোখ মেলে জগৎকে দেখা তার প্রকৃতিকে ভালবাসা, মানুষকে চেনা, জীবন দিয়ে জীবনের বোধকে রূপায়িত করার মধ্য দিয়ে সাহিত্যে তার কাজকে প্রকাশ করে চলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ভাল সুন্দর দিকটাও তুলে ধরতে হবে আর চিনে নিতে হবে সমস্যার পরিধিকে। এগুলিকে সাজিয়ে মূল্যায়নার সঙ্গে পরিবেশন করতে হবে পাঠকের দরবারে। প্রকাশ বা পরিবেশনার মধ্যে জীবনবোধের নিপুণ অঙ্কন দক্ষতাই সময় ও যুগের কাছে সম্পদ হয়ে রক্ষিত হবে। প্রসঙ্গ ক্রমে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজভাবে বলেছেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের জানা দু-রকমের, জানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্যকিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা।

সাহিত্য মূলতঃ উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে-আনন্দ।

লোরকার নাটক ঃ নাটকের লোরকা

পরিমল চক্রবর্তী

নাট্যজগতিক লোরকা অবশ্যই আমাদের আলোচনার অপেক্ষা রাখেন। কেননা তাঁর কবিসত্তার তুলনায় তাঁর নাট্যকারসত্তাও কিছুমাত্র কম দ্যুতিসম্পন্ন নয়। অধিকাংশ নাট্যকারের মতো তিনি মাত্র নাটক রচয়িতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ নাট্যকর্মীও। অন্যান্য মৃত্যুবোধান্বিত নাটকের সঙ্গে 'Mariana Pineda' বা 'মারিয়ানা পিনেদা', 'Bodas de Sangre' বা 'রক্তের পরিণয়', La Zapatera Prodigiosa' বা 'অপরূপা মুচিবৌ' এবং 'Yerma' বা ইয়েরমা' ইত্যাদির মতো পৃথিবীখ্যাত নাটক তো তিনি লিখেছেনই, অধিকন্তু 'লা বারেকা' নামক ভ্রাম্যমান বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠায় এবং স্পেনের দূর-দূরান্তের গ্রামে-গঞ্জে ঐ সব নাটক নিয়ে সেগুলির পরিচালকরূপে ঘুরে বেড়ানোতেও তিনি ছিলেন অক্লান্ত ও অগ্রণী। এমনকি নাটকাভিনয়েও তিনি ছিলেন রীতিমতো দক্ষ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাটকে অভিনয়ের সূত্রেই জীবনের শেষদিকে (১৯৩৩-৩৪ সালে) তিনি উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

লোরকার নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত এবং পরিণতি তাঁর কবিজীবনের যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের ঘটনা। তাঁর কবিতার মতো তাঁর নাটকেরও নানা দিক, নানা বৈশিষ্ট্য; তবে প্রেমের অনুগামী হ'য়ে মৃত্যুর আগমন এবং অন্তর্বাহ নিয়তির স্রোতই সেগুলির মধ্যে প্রধান। এবং এই বৈশিষ্ট্য, তাঁর প্রেমের কবিতাতেও অতি স্পষ্ট। তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা দশ। 'Romance Sonambulo' বা 'ঘুমের মধ্যে চলাফেরা-করা রোমান্স' তাঁর স্যুররিয়্যালিজমধর্মী লিরিক্যাল রচনা। প্রখ্যাত আইরিশ নাট্যকার জে. এম. সিঙ্গ (১৮৭১-১৯০৯)-এর সঙ্গে নাট্যকার লোরকার সাদৃশ্য (প্রধানত নাটকে মৃত্যুবোধসঞ্চারে) অনেকে খুঁজে পেলেও আয়ার্ল্যাণ্ড ও স্পেনের এই দুই খ্যাতকীর্তি নাট্যকারের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ বিদ্যমান। নাট্যসমালোচক হোগিন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সেই প্রভেদকে তুলে ধরেছেন। এ-সম্পর্কে বাংলা অনুবাদে তাঁর বক্তব্য অনেকটা এ-রকম—'আইরিশ সতীর্থদের মতো লোরকাও নাটকের মধ্য দিয়ে ভাষার জাদুকে ধরতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সিঙ্গ, ইয়েটস এবং লেডি গ্রেগরি যখন আইরিশ থিয়েটারের জন্য জাতীয় সাহিত্য প্রণয়নে প্রয়াসী হলেন, তখন লোরকা, বাস্তবসম্মত মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী নাট্যপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।'

আসলে আলোর জন্যে

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

দাম : আট টাকা

প্রাপ্তিস্থান

কথা ও কাহিনী, সিগনেট।

'৩৩টি কবিতার সংকলনে দেবকুমার মুখোপাধ্যায় সহজ শব্দের বুনোনে অতি সারল্যে জীবন জগৎ সময় এবং পরাবাস্তবের পরিকীর্ণ অনুভবগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। সমকালীন বাংলা কবিতার সুচতুর কৌশল গ্রহণ করে কবিতাগুলিকে জটিল ও দুর্বোধ্য করেননি। কবিমনের ভাবনায় তাঁর ও আবেগ সংযত অথচ মর্মস্পর্শী অকপট অভিব্যক্তি। সুখের কথা—কবি আশাবাদী এবং শব্দের শ্লীলতায় সচেতন।"

'কলেজ স্ট্রীট'

কবি ও ছড়াকার

অভ্রান্ত মিশ্র

রূপশ্রী দত্ত

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

ও

প্রতাপ সিংহের

মজার ছন্দে ও মজার ছবিতে

জমাটি ছড়ার বই

ছড়ার মজা খাস্তা গজা

শীঘ্রই বেরুচ্ছে।

বইমেলা ২০০০-তে প্রকাশ পাবে

প্রকাশনা : থার্ডওয়ার্ল্ড

পাবলিকেশন

প্রকৃতির দান

বিজনকুমার ভট্টাচার্য

পৃথিবীতে অনেকেই দান করে থাকেন। এঁদের মধ্যে আবার কারও কারও দানের তুলনা হয় না। সি. আর. দাশের নাম আজ কারও অজানা নয়। দানের খাতিরেই তিনি দেশবন্ধু নামে খ্যাত হয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দানের ইতিহাস তৎকালে পৃথিবীর কারও অজানা ছিল না। পুরাকালে দাতা কর্ণের খ্যাতি আজও সবার মুখে মুখে। ব্যক্তি-নির্বিশেষে এ হেন দানের যে বৈশিষ্ট্য, তা হল দাতা কখনও নিঃশেষে দান করতে পারে না। জীবন ধারণের নিমিত্তার্থে অতি স্বল্প অংশও তার প্রয়োজন হয়। নিজনিজ প্রয়োজন অনুসারে কোন দাতা কত অল্প অংশ তার জন্য রাখে, সেই মাত্রার উপরই হয় তার 'দাতা' হিসাবে খ্যাতি। বর্তমান সমাজেও অনেকে কম-বেশী দান ক'রে থাকেন; কিন্তু, তাঁদের মধ্যে কেউই দেশবন্ধুর সমকক্ষ হতে পারেন নি। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে দানের মাত্রার পার্থক্য, তার প্রকারের নয়। দান-কার্যের মধ্যে দিয়েই মানুষের মন বোঝা যায় — 'Gift is an act of liberality on the giver's part. কেউ দান করেন নিঃস্বার্থভাবে; কেউ বা আবার করেন পরিবর্তে কিছু পাবার আশায়। কিন্তু, সর্বক্ষেত্রেই দাতার মনের ভাল দিকটাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এইরূপ কাজের মাধ্যমে। দারিদ্র্য-পীড়িত সমাজে আজও এই দানকার্য অব্যাহত আছে জনসমূহের কিছু অংশের মধ্যে। পুরাকালের মত ব্রাহ্মণকে গো-দান, বস্ত্রদান আজও কোন কোনও স্থানে লক্ষ্য করা যায়। আচার্য বিনোবা ভাবের ভূ-দান যজ্ঞও এই রকম একটি দানের পর্যায়েই পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে, এ হেন কার্য দানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়লেও সব সময় তা' দাতার মনোভাব সূচিত করে না। দান করতে হয়, তাই করা হচ্ছে; অথবা দানের পেছনে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে, এইভাবেও তার অর্থ করা যেতে পারে। জন্ম থেকেই যাঁরা দানের মনোভাব নিয়ে আবির্ভূত হন, তাঁদের কাজে অবশ্য কোন রকম উদ্দেশ্য-প্রণোদনা না থাকাই স্বাভাবিক। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে যথাযথ পর্যবেক্ষণ করলে আজও এই সমস্যা-সঙ্কুল সমাজে অনেক নিঃস্বার্থপর দাতার সন্ধান মেলে।

ঈশ্বর-সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তার সমস্ত কিছুরই সন্ধান চালায়, প্রাথমিকভাবে, আপন জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে; কখনও কখনও ইতর প্রাণিদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ কার্য চালালেও স্বতই সে তার এই ধরণের কাজ সীমাবদ্ধ রাখতে চায় তার নিজের জাতির মধ্যেই। কিন্তু, সে কি কখনও একটুখানি পাশ ফিরে দেখবার চেষ্টা করেছে প্রকৃতি তার জন্য কী মেলে দিয়েছে সর্বক্ষণের জন্য ! তার সুপ্ত আবাহন মানুষ বুঝতে পারে না, তাই বুঝি এই অবহেলা প্রকৃতির উন্মুক্ত-দুয়ার দানের প্রতি। ব্যতিক্রম-নির্বিশেষে প্রকৃতির এই দান সকলেরই প্রাপ্তব্য; ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলেই প্রকৃতির দানের উপভোগকারী। প্রকৃতি কোথাও কোথাও এই দান অকৃপণ হস্তে এমনভাবে ঢেলে দিয়েছে যে মানুষ তার প্রশংসার ভাষা খুঁজে পায় না। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা তখন উপচে পড়ে। জার্মান-কবি গ্যেটে বলেছেন — 'Nature is the living and visible garment of God'. প্রকৃতির সৌন্দর্য ঈশ্বরেরই আবরণের অপরূপ প্রকল্প। এই আবরণরূপ প্রকাশে অভিভূত হয়ে কবির সিদ্ধান্ত হল এমন সৌন্দর্য একমাত্র ঈশ্বরের মেহাবরণ ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না। সর্বাবস্থায়ই যা' লক্ষ্যণীয়, তা' হ'ল প্রকৃতি তার সমস্তই মানুষের দর্শনসুখের জন্য দিয়ে থাকে; নিজের প্রয়োজন তার কিছুই নেই। নিশ্চেতন জড় হ'লেও ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রকৃতি-সত্তার সকলের জন্যই

উন্মুক্ত। শুধুমাত্র এই দান নিতে পারলেই হ'ল। তাইতো, হাজার-হাজার অর্থব্যয়ে লোকে বিভিন্ন পাহাড়ী-এলাকা, সমুদ্র-তটস্থান ইত্যাদি দর্শনের জন্য ছুটাছুটি করে থাকে। সমর্থ হলে এই উদ্দেশ্যে লোকে বিদেশেও পাড়ি দেয়। প্রকৃতির অকৃপণ দানের প্রতি মোহাবিষ্ট দর্শকগণ নির্বাক হয়ে ঈশ্বরের গুণগানে ব্যাপৃত থাকে। একদিকে যেমন প্রকৃতি তার দর্শকদের আনন্দ দিয়ে থাকে, অন্যদিকে এও সত্য যে প্রকৃতি তার অকৃপণ দানের মাধ্যমে বোঝাতে চায় যে, মানুষও প্রকৃতির অনুসরণ করুক। কবির ভাষায় বলতে গেলে — "আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাই-রে; কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই-রে। পাহাড়-শিখায় তাদের সমান, হই যেন ভাই মৌন-মহান ....". প্রকৃতি যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টি, মানুষে নিজেও তেমনি ঈশ্বরের সৃষ্টি। পৃথিবীর সমস্ত দার্শনিক, কবি, লেখক ইত্যাদি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি ভীষণ-ভাবে আকর্ষিত হয়েছিল এই প্রকৃতি-সম্ভারের প্রতি। তাঁরা বিভিন্ন লেখা এবং কবিতার মাধ্যমে কথা বলতে চেয়েছেন প্রকৃতির সাথে।

প্রকৃতির দানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল যে সে মানুষের মনকে আকর্ষণ ক'রে। দার্শনিক—মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র হয়। সে প্রকৃতির অবস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে; তার মনে অনেক প্রশ্ন এসে ভিড় করে এবং, পরিশেষে, বাক্যালাপেও সে সমর্থ হয় এই প্রকৃতির সাথে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-জীবন ছাড়াও ব্যক্তি-জীবনে এর প্রভাবের গুরুত্ব যথেষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন, যার ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি শান্তিনিকেতনকে শিক্ষার স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে মিশতে পেরেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে পাঠ্যাভ্যাসকালে ছেলেমেয়েরা যদি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে, তবেই হ'বে তাদের যথাযথ শিক্ষাদীক্ষা। শ্রান্ত পথিক যখন পথিমধ্যে ক্ষণিকের

জন্য রৌদ্রতাপ নিবারণার্থ প্রশস্ত অশ্বত্থবৃক্ষতলে আশ্রয় নেয়, তখন তৃপ্ত হৃদয় পথিকটি একমাত্র ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে ক্ষান্ত হয়। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রতাপের প্রখরতা সহ্যসীমা অতিক্রম করার পর যখন বর্ষার আগমন হয়, তখন লোকের মনে যে স্বস্তির ভাব আসে, তা' অন্য কোনভাবে মানুষ পেতে পারে না। প্রচণ্ড শীতের তীব্রতায় মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূর্যের তাপ স্বভাবতই মনে করিয়ে দেয় 'এ বিধাতার করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়।' প্রতি বৎসরই নির্দিষ্ট বিভিন্ন সময়ে মানুষ প্রকৃতিরই দানের আশায় অপেক্ষা ক'রে থাকে। তার অকৃপণ বারিধারা পৃথিবীর শস্যসম্ভার পরিপূর্ণ ক'রে থাকে। যথেষ্ট পরিমাণ শস্য না জন্মালে লোককে না খেয়ে মরতে হবে। গ্রীষ্মের দাবদাহে অতিষ্ট লোকদের জ্বালা দূর করার জন্যই তিনি পাঠান অফুরন্ত জলধারা।

প্রকৃতির উপর সদা নির্ভরশীল মানুষের সব রকমের আস্ফালনই নিরর্থক। মানব-জাতি জন্ম থেকেই প্রকৃতির মুখাপেক্ষী। বাক্‌সর্বস্ব মানুষ মাঝে মধ্যে নিজের সম্বন্ধে এমন উচ্চ ধারণা পোষণ করে, তখন প্রকৃতিও তার কাছে হয় উপেক্ষিত। প্রকৃতি কি তার দান শাশ্বতকাল এইভাবে বিলিয়ে যাবে জনগণকে ? তার দানের কি কোথাও ছেদ পড়বে না ? হয় কি এমন বিধাতার রাজ্যে যা' কখনও নিঃশেষ হয় না। তবেই তো স্বস্তি। অন্যথা, কে নেবে এত বড় গুরু-দায়িত্ব। বিধাতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে প্রকৃতির দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা আর কারও নেই। ক্ষুদ্র জীব হিসাবে তাই মানব জাতির উচিত দান-ধ্যানের ব্যাপারে সমস্ত রকম আস্ফালন ত্যাগ ক'রে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির দানে মুগ্ধ হয়ে তারই গুণকীর্তনে সদা ব্যাপৃত থাকা। সেটাই হ'বে মানবজাতির প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের একমাত্র একমাত্র এবং প্রধান উপায়।

ভারত ও বন্দেমাতরম সঙ্গীত

রমা দাশগুপ্ত

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিখন্ডিত হলো, জন্ম হলো পাকিস্তানের — তৈরীহলো একটা নব ইতিহাস। ভিটেমাটি ছাড়া লক্ষ লক্ষ লোকের হাহাকারে উৎসবের তোপধ্বনি ক্ষীণ হয়ে গেলো। শিয়ালদা ষ্টেশনের উদ্বাস্তুদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন সংসার নিভিয়ে দিলো উৎসবের আলোক সজ্জা। দেশত্যাগের বিষময় ফল তখন উপলব্ধি করতে আরম্ভ করল দেশের পদস্থ ব্যক্তিরা। হিন্দুস্থানে বৃদ্ধি পেলো মুসলমান আর পাকিস্তানে মুষ্টিমেয় হিন্দু ত্রাসে সন্ত্রাসে দিন কাটাতে লাগলো।

বাতাসে বারুদের গন্ধ গ্রাস করলো সমগ্র ভারতবর্ষকে। ভারতের জন্ম মুহূর্তে যে বিষবৃক্ষ রোপন করা হয়েছিল তার হাত থেকে আজও আমরা পরিত্রাণ পেলাম না।

অখণ্ডতা ঐক্য রক্ষার জন্য ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস রূপে অনুষ্ঠিত হয়।

দিকে দিকে গানের মধ্য দিয়ে জাতীয়তা বোধের ঐকতান শোনা গেলো।

বহু দেশাত্মবোধক সঙ্গীত বহুভাবে আমাদের হৃদয়ে ঝঙ্কার তুললো। এই সঙ্গীতগুলি আমাদের অহঙ্কার। ১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ভারত বিধাতা' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তার শুরু — "জন, গণ মন"। ১৯৪৯ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, বন্দেমাতরম সঙ্গীতকে জাতীয় মর্যাদা দিলেন। এই গানটি "জন, গণ, মন" গানের প্রায় ৩০ বছর আগে ১৮৮৭ সালে রচিত হয়।

এই গানটি সবথেকে প্রথমে গাওয়া হয় ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে।

তারপর ভারতের গণ পরিষদ "জনগনমন" গানকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্বাচন করেন এবং বন্দেমাতরম গানকে জাতীয় সঙ্গীত ও স্তোত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়।

বন্দেমাতরম গানের মতো কোন গানই এমন করে বাঙ্গালীর রক্তে তুফান তোলেনি। এর ভিতর যে গভীরতা, আদর্শ অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা বাঙ্গালীকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করেছে-করছে, এবং করবে। জন্মভূমিকে 'মা' বলে জানা, জন্মভূমিকে ভালবাসা, ভক্তি করা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের শিখিয়েছেন, বন্দেমাতরমের ভিতর দিয়ে। তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা এবং দেশকে শৃঙ্খল মোচন করার গুরু ও পথ প্রষ্টা। তার 'বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করে লাখো লাখো ভারতবাসী, হাসতে হাসতে আত্মবলিদান দিয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দর লিখলেন — "বঙ্গলক্ষ্মীর" ব্রত কথা যার শুরু ও শেষ হয়েছিল বন্দেমাতরম দিয়ে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার বন্দেমাতরম নিয়ে স্বদেশী গানের সংকলন করেছিলেন। অরবিন্দ প্রকাশ করেছিলেন বন্দেমাতরম পত্রিকা।

বৃটিশ একসময়ে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন বন্দেমাতরম সঙ্গীত উচ্চারণ করা। তখন ঐ একটি মাত্র শব্দ মন্ত্রের মত কাজ করতো। কণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো সবাই মরণযজ্ঞে। বৃটিশ ভয় পেতো শুধু কয়টা বাংলা অক্ষরকে — যার নাম 'বন্দেমাতরম'।

একদা এই গানে বহু লোকই সুরারোপিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ এই গানে সুর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাসের বোন অমলা দাশ যে অপরূপ সুরে এই গানটি গেয়েছিলেন, বোধ করি এমন মনোমুগ্ধকর সুরে এই গান আজ পর্যন্ত কারোর কণ্ঠে শোনা যায় নি।

এই গানটি ইংরাজিতেও অনুবাদিত হয়েছে, করেছেন স্বয়ং অরবিন্দ ও তার দাদামশায় রাজনারায়ণ বসু।

ভারত তথা বাঙ্গালীর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, হৃদয়ে কণ্ঠের সুরে, প্রতি-রক্ত কণিকায়, চির ভাস্বর ও অমর হয়ে থাকবে এই বন্দেমাতরম সঙ্গীত, একে নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা বৃটিশ সরকারেরও ছিল না — ভারত সরকারেরও নাই।

অর্ণিশা রায়চৌধুরী (ক্লাস নাইন, ডাফ স্কুল)

ছড়া লেখা সোজা নয়
ছড়া লেখা সোজা নয়,
যতসোজা মনে হয়।

ছড়া লিখবে ? লিখবে ছড়া ?
কেমন ছড়া ? কেমন ছড়া ?
টকঝাল ? না মিঠে কড়া ?
ছড়া লেখবার আগে দরকার
একটু-আধটু লেখা-পড়া।

আগে শেখো ছন্দটা, পরে লিখো ছড়া
নইলে ছড়াতো নয়, হবে তালবড়া।

বাবার কাছেতে বসে শিখি আমি ছড়া
তাই বলে নেই জেনো কোন হামবড়া।

অশোক মুখোপাধ্যায়

তাসখেলা

দু'টো হৃদয় তিনটে হীরে পায় না সাহেব যায় যে ফিরে।
রং খ্যালে না দোল খ্যালে — টেক্কা, গোলাম এবং চিড়ে ?
পাড়ার রকে, ক্লাব ঘরে এবং ট্রেনেও, খুব ভিড়ে।

বনসৃজন

মনের ভেতর বনসৃজন বাইরে বন হচ্ছে সাফা।
মন গ্যাছে গড়ের মাঠে গড়ের মাঠে চলছে রফা
মাঠের হাওয়ায় ঘোরাঘুরি এবং ধোঁওয়ার ওড়াওড়ি
মাঠ আর সবুজ তো নয়, ড্রইং রুমের ছেঁড়া সোফা।

অনিন্দ্য দেব

কলকাতার তিন ঋতু

গ্রীষ্ম ☐

প্রাণ আই-ঢাই চাঁদি ফাটে-এই শহরে গ্রীষ্ম
এমনতর কষ্টে ছিলেন পিতামহ ভীষ্ম ?

দিনেরাতে লোডশেডিংয়ের দাপট দুর্বিষহ
শরশয্যায় সুখে ছিলেন বৃদ্ধ পিতামহ।

বর্ষা ☐

টাপুরটুপুর বৃষ্টি পড়ে
নদে এলো বান
আজব শহর ডুবলো জলে
অবাক শ্রোতের টান
গড়িয়াতে নৌকা চলে
শিবপুরে তুফান।

শীত ☐

লেপ-তোষকে বাগ মানে না
শীত পড়েছে কনকনে
রুমহিটার কিনি কোথায় ?
আগুন দামে গনগনে
মায়ের চরণ করতে শরণ
তাই চলেছি ঠনঠনে।

আনসার উল হক

কেউ কেউ

চাল ডাল তেল নুন দাম চড়া ভীষণই
গরিবের কপালেতে বাড়াবাড়ি ফি-সনই
কারা ডাকে হরতাল সারা দেশ জুড়িয়া
জনগণ মারা যায় আগুনেতে পুড়িয়া
কারা করে মারামারি, চুলোচুলি দ্বন্দ্বে
কারা হয় জেরবার খালি খালি বন্ধে
সারা দেশ তোলপাড় একি অনাসৃষ্টি
কেউ কেউ লুটে খায় বাঙালীর কৃষ্টি।

আলো মজুমদার

তুমি চির অম্লান
যে আলোর শিখা জ্বেলেছো তুমি
হৃদয়ে অনির্বান
স্বর্গ মর্ত্যে গরীয়সী তুমি
— তুমি চির অম্লান।

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

হাইকু ছড়া
কফি হাউস
মিকি মাউস
চির প্রিয়
জেনে নিও।।

উত্থানপদ বিজলী

নীতি কথা
মন্ত্রী আমার কাকা
লক্ষ-কোটি টাকা
নীতি কথায় রাজনীতি ও
ভাঁড়ার করি ফাঁকা।

জগত লাহা

বিষ্টি পড়ে

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
তিনকন্যে দিন ডহরে হোটেল মোটেল যান
এক কন্যে ওপেল চড়ে যায় যারে পাঁচতারা
এক কন্যে হাওয়া খেতে পঁচিশ তিরিশ ভাড়া
আর কন্যে টেরামে চেপে, ভিক্টোরিয়া গিয়ে
'পুলিশ পুলিশ পুলিশ' বলে ওঠেন চেঁচিয়ে
রাস্তা বড়ো — 'ধরো ধরো' বলেন সমাজসেবী
চওড়া হাতে গদ্য লেখেন মহাশ্বেতা দেবী।।

ইনকেলাব

বড়োলোকের টাকার আহার
ছোটোলোকের খিদের পাহাড়
রাজনীতির রীতিরাজি
মিথ্যে কথা ভাঁওতাবাজি
কবির লেখা গদ্যময়
নারীর মেধা মদ্যময়
বড়োর পিরীত বালির বাঁধ
ইনকেলাব জিন্দাবাদ।।

তরুণ সান্যাল

পরিণয়

একটি লাইন লিখেছিলাম
পয়লা বোশেখ ক্যানভাসে
সেই তেরশো পঞ্চাশে যার
সেদ্ধভাতে ফ্যান ভাসে,
ভাত না ফ্যানেই ভাবল ছিল
বিধান সভায় আসন ছিল
বিভক্ত দেশ নাশন ছিল,
দেশ ভুলে যায় ধান চাষে
এখন যতই কবির মতই
লিখছি, শুনছি ফ্যানটাসি।
দেখছি এদেশ ওদেশ ভতই
চোখের জলে বানভাসি।

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

ইচ্ছে

বহুদিন চিংড়ির কাটলেট খাই নি
বহুদিন হল নিউ মার্কেট যাই নি;
না খেয়ে না খেয়ে হায় পেট গেছে চুপ্‌সে
সে ফাঁক ভরতে চাই ইলিশ ও ভপসে।

শুধু ঝোল আর ভাত
তাও চাঁচি পুঁচি পাত,
কুপোকাত আমি আজ গরমেতে ভেপ্‌সে
কোনদিন গ্র্যান্ডের চালঘরে নাইনি।

দেবাশিস প্রধান

পাখি (এক)

যাও পাখি দেখে এসো তাকে
অন্ধকার দহন দুর্বিপাকে
যাও যাও দেরি নয় আর
অহেতুকই কেন দাও ফাঁকি
এতটাই খাঁ খাঁ করা দিন
থাকুক না আরও কিছু, আলোর কুসুমকলি
আমাদের মহার্ঘ এ ক্ষণ

নীলপাখি (দুই)

নীল পাখি কি নামে যে ডাকি তাকে
যা চলে যা চলে হুস্‌
তেকে চিনি মুখোশে নির্মোকে ...
সবটুকু এতটাই ঘোর
আজতধু অবিরাম শেখাবো ফন্দিফিকির
অকাতর চাপান উতোর

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আসবে নতুন মুখ,
তোমার হাতে ফুলের মালা আমার মধুর হাসি
তাই দেখেই — উলুধ্বনি বাজলো সানাই-বাঁশি।

তোমার চোখে পদ্ম ফোটে আমার দু'চোখ দেখে
তাই দেখেই — মাথার উপর চাদর দিল ঢেকে।

তোমার মুখে লাজুক হাসি, আমার শুভ দৃষ্টি
তাই দেখেই — আকাশ থেকে হ'লো পুষ্প বৃষ্টি।

তোমার নতুন শাড়ির খুঁটে আমার ধুতীর গিট
তাই দেখেই — বুড়োবুড়ি হাসল মিট মিট।

তোমার হাতে আমার হাতটি কতো জন্মের সুখ
তারপরেই দৈববাণী — আসবে নতুন মুখ।

ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস

সত্যি কথা
ঘূর্ণিঝড়ে গাছের ডালে
টিনের চাল
চোখের জলে দুখের ছলে
পোড়া কপাল।

পাচ্ছে না তাই খাচ্ছে না
আমরা বধির
শুনছি না সেই কান্না
কিছুই কানে যাচ্ছে না।

পবিত্র অধিকারী

অরাতো বাংলোদ্যাশী না ☐
হাসতে হাসতে কইলেন শ্যাক্‌ হাসিনা
অরাতো বাংলোদ্যাশী না
পারাইলে যেই বডার
দিসনা ফিরার অডার
কেউ আর নেই খান্‌
বেবাক ইন্ডিয়ান।

পিওর হ্যনি ▢

বিত্ত হতে চিত্ত বড়, এই ভারতের মর্মবাণী
এসব কথায় বিত্ত রেগে কামড়ে ছিঁড়ে চর্মখানি
বললে, — ওহে চিত্তওলা
মর্মে আডি লাগাও তালা
তুমি বড্ড মানী হলেও আমার স্টকেই পিওর হানি।

কর্তা বলেন ▢

কর্তা বলেন, পালন কর হে হো-এর জীবনাদর্শ
পরে যান সটান জাপান সারাতে শালার অর্শ।

বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস

ছুটি ছড়া

এক
ভাল গেয়েও নাম-যশ নেই
কারণ তুমি স্থানীয়,
বাজে গেয়েও বোম্বের গায়ক
পাবেন কড়ি, পানীয়।।

দুই
নীরাম — এ্যাত্ত বই আপনি পড়েন ?
গ্রাহক আপনি ফাজ,
নীরাম — শোভা তারা আমার তাকের
পড়িতো ঘোড়ার আজ।।

বেবী দাস

ছড়া

এক
সারাবেলা নেতার চেলা নামটি তাঁর হরিদাস
হাটের মাঝে দুপুর বেলা হঠাৎ সে যে হলো লাশ;
জিভটি করে চুকচুক
নেতা বলেন, উজবুক
তারপরেই তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকেন চকলপ্রাশ।

দুই
পাড়ার শব দাহ করতে যেতে হতো দূরে
মন্ত্রী মশাই তাইতো পাড়ায় শ্মশান দিলেন গড়ে
ভোটের আগে মন্ত্রী বলেন
আবার যদি ভোটটা দেন
কথা দিচ্ছি প্রতি ঘরকেই শ্মশান দেব করে।

মতি মুখোপাধ্যায়

গুপ্ত প্রশ্ন : মুক্ত উত্তর

প্রশ্ন আমরা চোদ্দ বোলো, রক্তে ভাইবোন,
প্রেম অতিদূর যেতে হল যৌন মিলন।
যে আসছে মাকে সে কি পিসি বলবে
বাবাকে কি মামা বলে ডাকা তার চলবে ?

উত্তর রতি নিয়ে ভীমরতি করছো দুজনে,
বোঝোনি কি পরিবেশ, পচিবে দূষণে ?
শোধনের প্রয়োজন, গুণে গুণে বেত,
যেমন বয়েস যার এই অভিপ্রেত।

প্রশ্ন নাতনির বিয়ে দিতে মা সাগর-পার,
পঞ্চমশে ফের বিয়ে, বাবা হল চার।
তিন ভাই বোন মিলে কীভাবে তা মানি,
স্বজনে ও পাবলিকে করে কানাকানি।

উত্তর কিছুই করার নেই, উহাই প্রগতি,
পঞ্চমবার যদি মাতা চান পতি,
আপনারা কেন ভাই হোন তাঁর বর,
সিনেসে উঠবে নাম, পাবে সমাদর।

মিনতি মিত্র

দুচ্ছড়া

এক
জীবন আর নদী
দুজনেরই আছে গতি
তারা কখনও, সরল সুন্দর
কখনও ভয়ঙ্কর অতি।

দুই
প্রকৃতির প্রাণ আছে মানো কি ?
পাতাফুল ছিঁড়লে
বেদনায় কাঁদে তারা
জানো কি ?

মীনাক্ষি পাল

বিনিময়
মন উচাটন স্টিলের বাসন
বেশ কিছুদিন হয়নি কেনা
জমছে কত কাপড়-চোপড়
বলতে মুখে উঠছে বেনা
ফের যদি তুই বাগড়া দিবি
ত্রাণের জন্য কাপড় নিবি
সত্যি করেই বলছি তবে
কাপড় নিয়ে-ই খাবার দে-না।।

রণেন্দ্র কুমার ঘোষাল

অরুণ মিত্রের চারলাইন
মিত্র তোমার অরুণ আভার
হঠাৎ অবসান
পদ্য বনের পদ্মরা আজ
দুঃখে মুহ্যমান।

রূপশ্রী দত্ত

রবীন্দ্রনাথ (এক)
রবীন্দ্রনাথ নয়কো পুঁথির পাতায়;
রবীন্দ্রনাথ হৃদয় এবং মাথায়।
দুঃখদিনে অভয়মন্ত্র গান;
সকল কাঁটায় ফুলফোটানোর ধ্যান।

দুঃখ হতে উত্তরণের পথ
তিনিই দেখান, জানান সেই শপথ।
নিকষ আঁধি, সঙ্গে তো কেউ নেই;
একলা কোথায় ? সঙ্গে আছেন সেই
রবীন্দ্রনাথ, আলো পাঁজর-জ্বলা
পথটি দেখান, সহজ যে হয় চলা।
জানান তিনি, তুচ্ছ তো নই আমি;
ঈশ্বরও তাই প্রেমে আসেন নামি।
অসীমকে পাই সীমার ক্ষুদ্র খাঁচায়;
রবীন্দ্রনাথ মানেই প্রাণটা যা চায়।

অথ গৃহিনী-পরিচারিকা সংবাদ (দুই)
নারীবাদীর মিটিং সেরে ফেরেন মিসেস খাস্তগীর;
এইবার চাই তরকারী আর গোস্তা, লুচি আস্ত ঘি'র।
খেয়ে নেয়ে টেকুর তুলে ডাকেন — 'শোন, পাঁচীর মা,
দুদিন ছুটি চেয়েছিলে সেটাই দিতে পারছি না।
অসুস্থ হই, বাড়ী ফিরেই যদি না পাই জলখাবার;
রুটি আমার নেই কোনদিন শশা, কলা ফল খাবার।
মাইনেটাও বাড়িয়ে দিতে বলছিলেনা সেইদিনই ?
ভেবে দেখব পরে ওসব, যাচ্ছি তো কাল বেইজিংই।
নারীবাদীর সম্মেলনে দিতে হবে ভাষণ তো.
সেই কটা দিন গোমড়া মুখটা একটু রেখো হাসন্ত।
ঘরসংসার ঠিক করে সব সামলে রেখো এই কদিন;
জানি সবই এইবাজারে কেউ তো নহে কারো অধীন।
গেরাহ্যি নেই ? চুপচাপ যে, জবাব কেন দিচ্ছ না ?
কি আস্পর্ধা, চুপিসারেই পড়ল কেটে পাঁচীর মা ?

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

মন্দা
আড়ি আড়ি আড়ি
গালি-গালাজ যে যত দে
করবো বাড়ি—গাড়ি।

আড়ি আড়ি আড়ি
হাওলা-গাওলা সোনার তারে
বাঁধা আমার নাড়ি।

আড়ি আড়ি আড়ি
দেশের মানুষ মরলে মরুক
দেবোই বিদেশ পাড়ি।

আড়ি আড়ি আড়ি
সাত খুনেও বুক ফুলিয়েই;
কোন্ ব্যাটাকে ডরি ?

আড়ি আড়ি আড়ি
কি করবি কর না আমার
ঘরেই পুলিশ-হাঁড়ি ।

শৈলেনকুমার দত্ত

হুড়াহুড়ি

মাইকের চিৎকারে গোটা পাড়া মাত
খোকাখুকু উঠে গেছে রেখে বাড়া ভাত
পাশাপাশি ঘরবাড়ি কত খাড়া হাত !
তুমি বাপু খুঁজে দেখো কোথা ধারাপাত।

ধারাপাত কোথা পাব । খুঁজি সারা রাত
পোলকের বলে নাকি আজও লারা কাত
একে একে গেছে যারা দলে তারা সাত
তুমি বাপু খুঁজে দেখো নাড়ে কারা হাত।

জোড়া নিলে

খল হয় কপটেরা — খলখল হাসি তার
জর মারে সোনা তবু — জরজর দেহ কার ।
ধব যদি স্বামী হয় — ধবধব সাদা না ?
জব মানে দ্রুতগতি — জবজব কাদা না।
হুল বলে চাতুরিকে — হুলহুল ভরে চোখ
বক পাখি উড়ে গেলে — বকবক করে লোক।
ওড়ি বলে কাজকে — ওড়ি ওড়ি খোঁটা না ?
দম লাগে ভারী কাজে — দমদম ওটা না ।

আমড়াগাছি

নিতে সব ফুল বাছিয়া — যাব সেই কুলগাছিয়া।
ও বাবা । নেউলটিতে — হাত নাড়ে নেউলটি যে ।
থাকি সেই সাতগাছিতে — পারি না খাত বাছিতে।
যত বাস মৌরি আসে — তত বার গৌরী হাসে।
ওপাশে আমতা নাকি ? — পড়া সেই নামতা বাকি।
থামি সেই সাঁতরাগাছি — পিছু নেয় সাতটা মাছি।
হল কি আমড়াগাছি ? — এ নিয়ে আমরা আছি।

সহদেব দাঁ

যে পালঙ্কে শায়ীন রাজা
সে পালঙ্কের রাণি,
তবু তাঁরা যোজন দূরে —
কেন কী তা জানি ।
বায়সপাখির কী আসে যায়
পাকলে বিম্ব ফল ?
তবু বায়স ঠুক্‌রে সারা
বৃথাই গভর জল ।
সূর্য ওঠে পূর্বদিকে
পশ্চিমে যায় অস্ত —
জ্ঞানী বলেন : মিথ্যে কথা,
প্রাচীন ধোঁকা মন্ত।

সতীশ বিশ্বাস

তিন ছড়াকা

এক

দুই মুখে দুই কথা বলে ওর বউটা।
এ পাড়ায় বলে এক,
ও পাড়ায় অন্য।
সকালে যা বলে, 'ভাল'
বিকেলে 'অখদ্য'।
তাই তাকে বলে সবে খৈনির কৌটা।

দুই

বিপজ্জনক এই পূর্ণিমা রাতখানি ।
আকাশে মায়াবী চাঁদ
চারিদিকে পাতা ফাঁদ ।
দেখে এ আলোকধারা
হ'লাম যে দিশেহারা ।
যেন কোন উর্বশী ডাকে, দিয়ে হাতছানি ।

তিন

হঠাৎ কালোটাকার জোরে হয়েই তিনি বলীয়ান,
মাটিতে আর ফেলেন না পা।
কামনা তাঁর রয়কি চাপা ?
ছুঁই বেলীদের ঘরে গিয়ে,
দুই পা ওর গলায় দিয়ে
বলেন, 'অনেক ফুল তাঁকেছি,এবার ফুলের কলি আন।'

সিদ্ধার্থ সিংহ

এখন অবাক লাগে
ছিলে ডানা কাটা পরী কী লাজুক ছিলে
বুকটা জুড়িয়ে যেত তুমি ছুঁয়ে দিলে।
সাইকেলে চক্কর ঘুরি কাটাকাটি
তবলার রেওয়াজও হয়নি তো মাটি।
রয়েসয়ে হাত-চিঠি লুকিয়ে বেরোনো
নড়বড়ে সাঁকো পথ সহজে পেরোনো
এখন অবাক লাগে এমন ছিলাম
কেমন করে যে হল এসব নীলাম।

সুবোধ সরকার

গায়কের বিয়ে
এদেশ দিয়ে ওদেশ দিয়ে
ধর্ম নিয়ে, ধর্ম দিয়ে
গান নিয়েছে একটি চিলে
ঠিক তখনি পাঁচটি বিয়ে।

সুরভি ঘটক

দ্বিতীয় কৈশোর

মন ছিল না ঘরের কোণে মন ছিল না হাতে
একলা বিকেল দাঁড়িয়ে ছিল বিষণ্ণ প্রভাতে।

হাতের মাঝে যেদিকটাতে সবুজ সারি সারি
ঐখানেতে বিছিয়ে ছিল উদাস দুচোখ তারই।

ঝাঁকড়া মাথা উঁচুর গাছে দুলছে যেন কী ।
শুকনো পাতা, মচকানো ডাল ? পাখির বাসা দেখি।

সুকুমার রুদ্র

লিমেরিক

এক যে ছিল বৃদ্ধ, দারুণ জ্ঞানী
সকলে সে কথা সবাই মানি।
বলে 'কৃপণ' বলেন রেগে
সঞ্চি' আমি অন্যে ভোগে
আমিই হলাম সাচ্চা মহাদানী।

সৃজন পাল

দ্বারকা সংবাদ

রেশনেতে চাল নেই আছেন টি.এন.
চিনির বদলে আছে সুস্মিতা সেন ।
তারপরও এ দ্বারকায় বল নাই নাই
এই তো সেদিন দিনু আরও এক রাই।

মাসতুতো দল

দরজায় খিল দিতে কেউ আর ভোলে না
কেউ আর ভুল করে রাতে দোর খোলে না
তাই বড় মুশকিল
কি যে হল হালফিল
মাসতুতো ভাইয়েদের দিন আর চলে না ।

তাই বলে ভাইয়েরা চুপ বসে পড়বে,
ভাবে বসে কি করে যে ফুটো হাঁড়ি চড়বে।

দু'ভাইয়ের চেষ্টায়
ঠিক হল শেষটায়
'মাসভূতো দল' গ'ড়ে গণভোটে লড়বে।

সেকেন্দার আলি সেখ

ভোটের নামে
ভোটের নামে ভেল্‌কিবাজী শহর-গ্রামে-বন্দরে
ভোটের নামে রাহাজানি খুন-খারাবির মন্দরে
ঝগড়া বাড়ে ভোটের নামে
রক্ত দেখে ঝগড়া থামে
সভা হল খুন-খারাবি, বারুদ-বোমা গন্ধরে !

শীঘ্রই বের হচ্ছে

বাংলার ছড়া

আধুনিক ছড়াচর্চা ও
ছড়া গবেষণার ত্রৈমাসিক পত্রিকা
প্রথম সংখ্যার সম্ভাব্য লেখকসূচী

অন্নদাশঙ্কর রায়, অমিতাভ চৌধুরী, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সরল দে, শৈলেন কুমার দত্ত, ভবানী প্রসাদ মজুমদার, অপূর্ব দত্ত, দীপ মুখোপাধ্যায়, অভীক বসু, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অবি সরকার, জগৎ লাহা, অরুণ কুমার চক্রবর্তী, চিত্রা লাহিড়ী, দীপক লাহিড়ী, শ্যামল জানি ঘাস, রতনতনু ঘাটি, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, নুরুল আমিন বিশ্বাস, দেব কুমার মুখোপাধ্যায়, অরান্ত মিশ্র, প্রতাপ সিংহ, অনিন্দ্য দেব, শংকর বসু, অঞ্জলি চক্রবর্তী, রূপশ্রী দত্ত, অর্পিতা রায়চৌধুরী প্রমুখ।

সম্পাদনা ঃ

অশোক রায়চৌধুরী, শৈলেন কুমার দত্ত, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রতাপ সিংহ, রূপশ্রী দত্ত, রূপক চট্টরাজ এবং ভবানী প্রসাদ মজুমদার।

যোগাযোগ ঃ কফিহাউস দপ্তর।

শারদীয়া

অণু-সাহিত্যসন্ধ্যা কফি হাউস
আয়োজক
কফি হাউস পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিন
ওয়ার্কশপ

তারিখ ঃ ২১শে অক্টোবর, শনিবার, ২০০০

সময় ঃ সন্ধ্যা ৫-৩০ (৫ টায় আসন গ্রহণ)

স্থান ঃ পাঃ ঋ বাংলা আকাদেমি সভাঘর (দ্বিতল)

অনুষ্ঠানের বিষয় ঃ কফি হাউস পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ/বিজয়া সম্মিলনী/কবিতা পাঠ/আবৃত্তি/গান/ছড়া/অণু-গল্প পাঠ
(উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে আহ্বান করা হবে)

বিশেষ অনুষঙ্গ ঃ কৃতী ও বিদগ্ধ আবৃত্তিশিল্পী শ্রীপ্রিয়লাল রায়চৌধুরী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও এইডস বিশেষজ্ঞ ডাঃ কানাইলাল ব্যানার্জী ও ডাঃ এস. কে. ওঝাকে সম্মাননা জ্ঞাপন। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় ঢঙে বৈঠকী আড্ডায় (১০ মিনিট) অরান্ত মিশ্র। একক কবিতা পাঠ (১০ মিনিট) মণিভূষণ ভট্টাচার্য।

সূচী

এই অনুষ্ঠানে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আহ্বায়ক
অশোক রায়চৌধুরী (কফি হাউস)
ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস ও
জয়দীপ চট্টোপাধ্যায় (ক্রিয়েটিভ চ্যানেল)
মিহির সরকার (সহজ)
গণেশ ভট্টাচার্য (প্রিয় সঙ্গম)
দেবকুমার মুখোপাধ্যায়
শংকর বসু।। প্রতাপ সিংহ (কফি হাউস)

English Poems from Bengali Pens

Broja Chattopadhyay

Booking into the time-train

Booking into the time-train who knew –
was such a difficult thing?
I stood in queue – it was nearing
a sudden power-cut everything stopped –
I talked to someone before me – who stood –
fumbled perhaps he knew, no more
accommodation was there –
And when the power returned – it was
all glittering around – harsh voice came out
– no more booking in the time-train-
if the next one ever would be fixed –
Then follow – I returned –
I thought booking into the time-train
was not well-timed
And that time never I could reach.

[Poet failed to produce real Micro-Poem. He should remember the doctrine of Flabbier– 'use more often your erasure than your pen' and maximum effect with minimum materials.

Editor Coffee House

Dr. Manas Bakshi

Micro-verse

1. Eternity-a luring word,
   Life-a true reward
   Of five elements throbbing
   With a soul-like spark.

   Fill up the blank –
   The class teacher once said.
   Life itself is a hollow
   Fight of love has made.

3. The soul searches God.
   The self is in confine.
   Life begins to writhe
   When man has it to define.

   Now the moment is breaking
   Myself too –
   The liquer will neither change its colour
   Nor will it betray like you.

   Looking at me
   The mirror says
   What you look like
   Ridicules your inner-self!

   Individual identity
   Splintered as a glass –
   Striving for a toehold
   Man in a material world.

   Starry night.
   Gesture of love.

Rekha Nath (Delhi)

The Memory □

The agonising memories of
sad partings with you
nailed to the heart
like a calender
hanging from the nail
Whenever the wind of memories
rush to me, my heart bleeds profusely
and my wound deepens continuously

The Leader ☐

I know my right very well
I know how to demand on
my near and dear ones.
What had yudhishtir done?
He had only put his brother and
wife at stake
I put the whole country at stake.

Famine ☐

Full many a times I pretend my self
Full many a time I Grambled awey my life
Like a gambler
Now, there is a terrible famine
in my kingdom of dreams
Restless mind. A flying dove.

☐

Never blame love, blame yourself
For whatever you didn't get
In return for your love
One-sided, even if whole-hearted.

☐

Eternal life
A missing link
Between the first kiss and
The last effort to blink.

☐

Rain brings back teardrops
For love to begin with simple things.
Rain washes off teardrops
For poetry to claim its origin.

Pronab Kumar Majumder

Micro-Verses

One ☐

One can choose one's wife
But can not choose the mother
One can choose one's husband
But not the father

Two ☐

Mother's attachment to child
Grows in her womb
Father's familiarity grows
As the child grows around

Three ☐

Mother loves the child
As her own part
Father does it as emulation
of mother's art

MICRO-CRITICISM OF ENGLISH POEMS :

Among the four poets Dr. Manas Bakshi & Mr. Pranab Kumar Majumder Contributed real Micro-Poems and Smt. Rekha Nath (Delhi) has contributed most forceful, deliberate and philosophical poems, but some of them exceeded the limit of Micro-Poems. Micro-Poems demand maximum effect with minimum materials. 'Use moreoften your erasure than your pen' – is the basic concept of Micro-Poems.

Editor : Coffee House

অণুগল্প অণুগল্প অণুগল্প অণুগল্প

ছায়াসঙ্গিনী

অভ্রান্ত মিশ্র

আমার লেটেস্ট ব্লাডরিপোর্টটা দেখার পর ডক্ত ভিজিটার্সের সংখ্যা কমতে শুরু করে। হেপাটাইটিস 'বি' — ইজ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান এইডস্। — ব্যাস্, আর যাবে কোথায়, যেসব সুন্দরী বিদুষী সাহিত্য-সঙ্গিনীরা প্রায় প্রতিদিনই সন্ধেবেলা নিয়ম করে নার্সিংহোমে কবিতা ও গল্প শোনাতে আসত, তারা সবাই মুহূর্তে নিপাত্তা। এদের মধ্যে অন্তত তিনজনের সঙ্গে আমার তো প্রায় আক্ষরিক অর্থে বিয়েই হয়ে গিয়েছিল। মায়াপুর, দীঘা, বকখালি ফ্রেজারগঞ্জ — এবং একজনের সঙ্গে এইতো গতমাসেই চাঁদিপুর ব্রুফল্স কটেজে — পরপর তিনদিন হোল নাইট...। আঙ্গুর ... আপেল ... খাজুরাহো .. রয়ালস্ট্যাগ কোহিনুর।

ভিজিটিং আওয়ার্সে আমার এখন শ্মশানের শূন্যতা। মলি, ডলি, তৃষ্ণা, রেবা, মঞ্জরি এরা সব কোথায় !! তখন যে মেয়েলোকটাকে মনে হত পৃথিবীর সব চাইতে কুরূপা, আনস্মার্ট, দজ্জাল ও ঝগড়ুটে— আরও কত বিশেষণ সম্পৃক্ত...।

এখন সেই আমার একমাত্র আশ্রয় — ছায়া সঙ্গিনী। পৃথিবীর কোনো সংক্রামক ব্যাধি বা ভাইরাসই তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরাতে পারছে না। বোধ হয় মৃত্যু শয্যাও সে সহগামী থেকে যাবে। ওই তো সে হেঁটে আসছে ঘাম মুছতে মুছতে অড়র পাতার রস হাতে করে। তাহলে এতদিন যারা ছিল তারা !!!

পাঠি

অর্চনা পুরকায়স্থ

বাইরে গাছ কাটা চলছে। ঠুক্‌ঠাক্। সমরেশ বিধ্বস্ত। উঠোনের এই কাঁঠাল গাছটার সঙ্গে স্ত্রী সুমিত্রার একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ছিল সখ্যতা। তার হাতেই গাছটার জন্ম। ছেলে আর ছেলে-বউ এর আরও ঘর তৈরির স্বপ্ন সফল করতে তাদের বহু দাম্পত্য-সুখের সাক্ষীর অকাল অপমৃত্যু। সমরেশের, সংসারে মায়ার বন্ধন কেটেছে স্ত্রী মারা যাবার পরই। এখন নিয়মে বাঁধা পড়ে সংসারে টিকে থাকা। তবু যেন কোথায় পিছুটান। সমরেশ পশ্চিমের জানালা খুললেন। অস্তোন্মুখ সূর্যকে দেখে ভাবলেন সূর্য ডোবার সময় হল। সমরেশ চোখের কোণ স্ত্রীর বানানো রুমালে মুছে শরীরে গলানোর জন্য পাঞ্জাবি নিলেন হাতে। ছেলের কাছে হারার আগে স্ত্রীর হাতছানিতে সাড়া দেওয়াই ভাল। মন স্থির। হঠাৎ দরজায় টোকা। সমরেশ দরজা খুললেন। প্রতীক। সমরেশের নাতি। সমরেশের চোখের কোণে আবার চিকচিক। প্রতীক এগিয়ে এল। দাদুর দিকে বাড়িয়ে দিল সদ্য তৈরি একটা লাঠি। কাঁচা গাছটার ডাল কেটে বানানো। সমরেশ অথৈ সমুদ্রে খড়কুটোর মতই প্রতীক আর লাঠিটাকে একসঙ্গে আঁকড়ে ধরলেন। তার পরে পাঞ্জাবিটা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝোলালেন। জানালার কাছে সরে আসতেই দেখলেন যাবার আগে সূর্য পশ্চিমাকাশকে লাল আভায় রাঙিয়ে দিয়েছে। অস্তোন্মুখ সূর্য যে এত সুন্দর হতে পারে এই প্রথম জানলেন সমরেশ।

সাঁঝের

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

ফি শনিবার সাধারণতঃ আমি বাসস্ট্যান্ড থেকে সোজা সোনাতোড় পাড়ার মুসলমান বস্তির ভেতর দিয়ে সরু গলি ধরে যাওয়া-আসা করি পার্টি অফিসে। গলিটা বড়ই অপরিচ্ছন্ন। কাঁচা নর্দমার তরল পদার্থ উপচে পড়ছে রাস্তায়। মরা কুকুর-বেড়ালের ছানা, কাঁঠালের ভুতি, নোংরা কানি সবই ভাসছে সেখানে। একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত-ও উঠে আসতে চায়, তবু আমাকে এই পথ ধরেই যেতে হয় শর্টকাট বলেই।

গলির মুখেই একটা দোতলা বাড়ি অনেক খানি জায়গা জুড়ে খামার। গোয়াল বাড়ি আছে সেখানেই। বারান্দায় পাকা আমের মত এক বুড়িকে সব সময় বসে থাকতে দেখি ঐ ভ্যাপ্‌সা গন্ধের মধ্যেই। সাধারণ মোটা ধুতি পরলেও যেন ফুটে বেরুতে চায় ওঁর আভিজাত্য। আমি পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলেই উনি বলবেন — কটা বাজল বাবা ? চারটে বাজল ?

স্কুলের ছুটিছাটা থাকলে পুরন্ত দুপুরেও ঐ পথেই আমি যাই। দেখি, উনি বসে আছেন। খাওয়া দাওয়া করে চুল শুকোচ্ছেন রোদ্দুরে। সেই এক প্রশ্ন কটা বাজল বাবা ? চারটে বাজল ?

বড় অবাক লাগে আমার। চারটে বাজলে ওঁর কি সুবিধা হবে ? চারটের সময় কেউ কি আসবেন ওঁর কাছে ? কোন প্রিয়জন ? তো সেদিন হঠাৎ বারান্দার পাশ দিয়ে যাবার আগেই দেখা হয়ে গেল ওঁদের এক মাহিন্দারের সঙ্গে। গোয়ালবাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিল কোন কাজে। আমি জিজ্ঞেস করলাম — আচ্ছা ঐ বুড়িমা দিন শোধান আমাকে চারটে বাজল বাবা, কেন হে ? আমার বড় কৌতূহল হয়।

— আজ্ঞে তেমন কুছু না। আশি পেরিন গেইছে বাবু, তবু বুড়ি মরে না। তাই বস্তু আস্তি আর তেমন হয় না বাবু। বুড়ির ছেলে মস্ত বড় উকিল — অঢেল পয়সা। চারটের সময় উনি ফেরেন, তখন চা হয়। বুড়ির খালি চা খাবার মন। কে দেবে ? তাই জিজ্ঞেস করে চারটে বাজল বাবা ?

শরীরটা হঠাৎ বিগড়ে যাওয়ায় দুসপ্তাহ পার্টি অফিস যেতে পারিনি। আজ আবার ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। বুড়ির ওপর কি রকম যেন মায়া বসে গেছে। প্রতীক্ষায় ছিলাম বাবা ডাকের জন্যে। দেখলাম বারান্দা শূন্য। নিরবয়ব শূন্যতা। ওপরের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, বিরাট প্যাণ্ডেল। অনেক মানুষজন ঘোরাঘুরি করছে। ব্যস্তসমস্ত সেই মাহিন্দারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎই। জিজ্ঞেস করলাম — বুড়িমা কই ?

একগাল হেসে ও বলল — বুড়ি আর নেই বাবু। উয়োর ছুটা বেজে গেইছে। বিরাট ভুজ হবে গো বাবু। বিরাট ভুজ।

প্রশান্তি নামল আমার মনে। সায়াহ্ন এসে কেমন হাত ধরে নিয়ে গেল অপরাহ্নকে দিকচিহ্নহীন, প্রশ্নহীন এক জগতে।

আকাশ নদী

অমল কর

আমি জেগে বসে আছি নীল নীল জলের কাছাকাছি। জল দুলছে, ফুলছে, উঠছে, নামছে, ফেনা হচ্ছে, ফেনা ভাঙছে। বইছে কড়ো হাওয়া। এলোপাথাড়ি নৌকা ভাসছে — চলার না আছে কোন ছিরি, না কোন ছাঁদ। পর নির্ভর — হাওয়া নির্ভর — নিজস্ব নেই কিছু। বাপের পয়সায় খাওয়া; ফুর্তি মারা, সোমত্ত শিক্ষিত বেকার বেহায়া যুবকের মতো উলু বুলু। নৌকার পালগুলো ফুটবলখেলায় মাঠের বিভিন্ন দলের জার্সির মতো রঙবেরঙের সতরঞ্জি-মার্কা। গ্রাম বাংলার মেঠো ময়দানের আপনভোলা উদাসকরা বাউলের তাল্লামারা গাত্রবাসসম। হঠাৎ একটা ঢাউস সাম্পান হেলে দুলে জল কাঁপিয়ে সিটি বাজিয়ে যাবার তাড়ায় জাপন দিয়ে চলে গেলো। আকাশটা হঠাৎ কেমন পাণ্ডুর বিমর্ষ ধূসর। এই তো একটু আগেও নীল ছিল। অমন বিবর্ণ ম্লান পাঁশুটে চেহারার আকাশ সব ধাতুতে সর্বত্র চট্‌জলদি দেখা পাওয়া ভার — অক্ষরে সবরে কোথাও হয়তো ক্ষণিকের জন্য থিতু দেখা যায় — তাও আবার চষে বেড়াতে হবে সারা আকাশ খোঁজার চোখ নিয়ে। এখন তো আকাশই চোখে পড়ে না শহরে — শহরতলিতে। প্রমোটারের হাঁ-খাওয়া আকাশকে গিলে খাচ্ছে।

আকাশের রং বদলানোর সাথে নদীর জলের রং হঠাৎ কেমন সিরসিটির মতো আলাই পালাই বদলে গেলো। কি আকাশ, কি নদীর জলের সঠিক রং ছকে উঠতে পারলাম না। জবুথুবু চাউনি নিয়ে তোলপাড় উড়ুক্কু ভাঙচুর মনের অবস্থায় নিষেধে চেয়ে রইলাম — আকাশে কখনো, কখনো নদীর জলে।

অস্তিত্ব বুদ্ধি বিবেক চেতনা রক্ত মাংস বিবেচনা হালু-হালু করে কামড়াচ্ছে।

দশ দশটা বছরের শীত বসন্তে অজস্র দিন রাতে আমার আকাশ আমার পৃথিবী দিয়েও জয়িতার চোখের ভাষা মনের গভীর ভালো মন্দ আকাশ নদী আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

এটি অণুগল্প হয়নি। এটা গদ্যরচনা ও কবিতার ককটেল বলা যায়।

সম্পাদক ঃ কফিহাউস

বাৎসল্য

অঞ্জলি চক্রবর্তী

গালের কাছে হাতটা তুলেও নামিয়ে নিলো শ্রীময়ী, মাথার মধ্যে রাগটা কেমন ঝিম মেরে গিয়েছে। কতদিন আসেনি ছেলেটা। পুজোয় আসবে বলেছিলো, সে-ও তো কতদিন হয়ে গেলো, এর মুখটা অবিকল ছেলেটার মতন, একটা অন্যমনস্কতার মধ্যে হারিয়ে যায় শ্রীময়ী। পকেট-মারটা ততক্ষণে অন্য কামরার হ্যান্ডেলটা ধরে নিয়েছে।

গাড়ি

অসিতকৃষ্ণ দে

আধুনিকতার ছোঁয়াচ বিহীন আজ পল্লীগ্রাম। অনেকের কাছেই নাম ছিল অজানা। অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা দুজন কৃষক খুন হওয়ায় হঠাৎ দৈনিক সংবাদপত্রের শিরোনামে। বিরুদ্ধ দুই বিবাদমান রাজনৈতিক দলের দাবি — মৃতরা তাদের লোক। ফলে সংবাদপত্রের কলমে চলেছে পরস্পর চাপান ওতর। এদিকে গ্রামের শান্ত পরিবেশে উত্তপ্ত আবহাওয়ার পরিমণ্ডল।

কেনারাম মন্ডল এই গ্রামে বেশ কিছু জমি জায়গার মালিক, ব্যবসাতেও ইদানীং বেশ টাকা পয়সা করেছে। ব্যবসার সূত্রেই কলকাতায় তার যাতায়াত এবং একটি রাজনৈতিক দলের লোকেদের সঙ্গেও বেশ দহরম-মহরম। অনেকদিন থেকেই তার মনে গ্রামের নেতা হওয়ার একটা সুপ্ত বাসনা তাকে চঞ্চল করে তুলছিল। কিন্তু সেরকম সুযোগ না পাওয়ায় . .। এখন এরকম অপ্রত্যাশিত সুযোগ যে একেবারে তার দরজায় এসে উপস্থিত হবে সে ভাবতে পারেনি। কলকাতায় ঘটনাটুকু যোগাযোগ করে গ্রামে প্রতিবাদ সভা করার সব আয়োজন পাকা করে, গ্রামের কিছু মানুষকে টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে নিজের চেলা-ও বানিয়ে নিয়েছে। মহকুমা শহর থেকে মাইক ভাড়া নিয়ে এসে সাইকেল রিক্সায় তার প্রচারও শুরু হয়ে গেছে।

এই প্রথম কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই গ্রামে আসছেন। বিশেষ করে বীণা রায়ের মত জাঁদরেল মন্ত্রী। সেইসঙ্গে আসছেন মেজ-সেজ প্রায় হাফ ডজন নানা মাপের নেতা। এই নিয়ে গ্রামের চারদিকে বেশ সোরগোল পড়ে গেছে। মন্ত্রী এবং নেতারা পিচ্ রাস্তা অবধি গাড়িতে এসে গ্রামের কাঁচা রাস্তায় পায়ে পায়ে সভাস্থলে হাজির হবেন। কেনারামের এই পরিকল্পনা মনে ধরে নেতাদের। সেইমত আয়োজন হয়েছে। গ্রামের মানুষের সহানুভূতি পাওয়া এতে সহজ হবে।

নিজের একখন্ড বড় জমিতেই সভার আয়োজন করেছে কেনারাম। খরচের খামতি নেই। বিকালে সভা। দুপুর থেকেই সপরিবারে মানুষ আসতে শুরু করেছে। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনার জন্য পিচ্ রাস্তায় অপেক্ষা করতে থাকে সে।

মন্ত্রী, সেইসঙ্গে প্রায় হাফ-ডজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে সভাস্থলে এসে চক্ষু চড়কগাছ হবার উপক্রম হয় কেনারামের। কিছুক্ষণ আগেও তারা জনসমুদ্র দেখে গিয়েছে, আর এখন মাঠে অর্ধেকের বেশি লোক উধাও। সর্বনাশ। গেল কোথায় সব ? তবে কী বিপক্ষ দলের লোকেদের কারসাজি ? প্রথমে এরা রা কাটেনি, মজা দেখছিল। শেষে । একজন হাফ নেতা এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করে — কী হল মশাই, মন্ত্রীকে এত ঘুষিয়ে-সুষিয়ে নিয়ে এলুম আর এই কটা মাত্র লোক ? লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় কেনারামের।

সামনে একজন চেলাকে পেয়ে খেঁচিয়ে ওঠে — 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী ? লোকগুলো গেল কোথায় দেখ, টেনে নিয়ে এস।'

মিনিট কয়েকের মধ্যে ফিরে আসে সেই চেলা। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে — কেউ যায় নি, আছে। সবাই ভিড় করেছে গিয়ে পিচ্ রাস্তায়। বলছে মন্ত্রী হন আর নেতাই হন, মানুষ তো বটে ! সে তো রোজই দেখছি। এমন সুন্দর হরেক গাড়ির মেলা কী আর দেখতে পাব ? এক্ষুনি তো চলে যাবে। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় বটে।

কেনারাম হতভম্ব হয়ে চেলার মুখপানে তাকিয়ে থাকে। মন্ত্রী এবং নেতাদের নানান মডেলের সুন্দর সুন্দর গাড়ি যে তাঁর এতবড় সর্বনাশ ঘটাবে, তাঁর কল্পনায় ও আসেনি।

আয়না

এ মাল্লাফ

সোনামাসি — তোমাদের আয়নাটা একবার দেবে ?

সোনামাসির সচ্ছল পরিবার, মেসোর গ্যারেজ আছে। আয় ভাল। সোনামাসির একমেয়ে, এক ছেলে, ছেলে ছোট - স্কুলে পড়ে, মেয়ে লতা কলেজে পড়ে। লতা নিজের পেটে ধরা মেয়ে নয়। পিতৃ মাতৃহীন অনাথ। রাস্তা থেকে তুলে এনে মানুষ করেছে। লতা, সোনামাসিকে নিজের মা বলেই জানে।

সোনামাসি গৃহ কর্মে লিপ্ত। নিশ্চয় আমার কথা শুনতে পায়নি _ তাই আবার বেশ জোরেই বললাম — সোনামাসি গো, তোমাদের আয়নাটা একবার দেবে ?

— সোনামাসি এবার মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল — আয়না কি করবি ?

— দিদিমা, মুখ দেখবেন ?

— তোদের ঘরে আয়না নেই।

— ছিল, মা-বাবাতে ঝগড়া করতে করতে, বাবা মাকে আয়না ছুঁড়ে মেরেছেন। আয়নাটা ভেঙে চৌচির। ভাঙা আয়নাকে জোড়া দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তাতে আর মুখ দেখা যাচ্ছে না।

— সোনামাসি বলল — পাড়ার সোমনাথ বাবুরা তো বিশাল ধনী। তিনতলা বাড়ী ওদের তো অনেক আয়না, চেয়ে দেখ না ?

— করুণকণ্ঠে বললাম — গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি। ওরা বলল — ওদের সব ঘরেই আয়না দেওয়ালে বসানো আছে, ওদের ঘরে গিয়ে মুখ দেখে যেতে হবে। দিদিমা তো অসুস্থ সে যাবে কি করে।

— তাহলে ভূপতি বাবুর বাড়িতে যা

— না বাবা, ভূপতিবাবুরা ঘরের বৌকে পুড়িয়ে মেরেছে। দিদিমা — ওদের বাড়ির আয়নাতে মুখ দেখবেন না। আগে শিক্ষকরা—ছিলেন সমাজবন্ধু। ভাল আয়নার কাজটা করতেন। তারা ছিলেন সত্যিকার মানুষ গড়ার কারিগর। এখন তাদের মাইনে বেড়েছে কন্তু তারা — মানুষ গড়তে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ। আগে দেশ সেবার জন্যে লোকে ভোট চাইতো, এখন নিজেদের আখের গড়ার জন্যে মানুষ ভোট করে।

কেলজিয়াম গ্লাসের মতই — নীতি শিক্ষা দেশ থেকে উধাও। সত্যবাদীদের আজ সমাজে স্থান নেই।

সোনামাসি বলল — আয়না, লতার সুটকেশে আছে। তুই যা লতা কলেজ থেকে ঘরে এলে, আমি যাবো তোর দিদিমার কাছে।

সোনামাসি আয়না নিয়ে দিদিমার কাছে আসতেই, দিদিমা — সোনামাসিকে জড়িয়ে ধরে কয়েকটা চুমু খেয়ে বললেন — তুই তো আমার আয়না, তোর মুখ দেখলেই সুস্থ চিন্তা ভাবনা, আর সুস্থ সমাজটা আবার দেখা হয়ে যায়।

আগে ভাল আয়না তৈরির জন্যে ভাল ভাল কারিগর জন্মাতেন। দুঃখের কথা রামকৃষ্ণের পর এদেশে তেমন আর কেউ জন্মায়নি, তার তৈরি বিবেকানন্দ, আজও বিস্ময়ের বিস্ময়।

এদেশে এখন আর ভাল আয়না তৈরির মিস্ত্রী কোথায় ? মুখ দেখার মত স্বচ্ছ আয়না দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে।

এ মাল্লাফ-এর এটি অপ্রগল্প হয়ে ওঠে নি। এটি একটি অপূরম্য হয়ে গেছে। গল্প ও রম্যরচনার মধ্যে পার্থক্যবোধ মাল্লাফ ভুলে গেছেন নাকি ?

সম্পাদক : কফিহাউস

চোরা কুঠুরির আঁধার

কৃষ্ণা বসু

সুমনা উঠে যেতে সজল তার টেলিফোনের কাছে নিঃশব্দে এগিয়ে যায়, একবার উঁকি মেরে দেখে নেয় সুমনা কোথায় ? দেখে যে সুমনা রান্নাঘরে গিয়ে তাদের দুজনের জন্য কিছু খাবার বানাচ্ছে। এক অপ্রতিরোধ্য টানে সে কাজুরীকে ফোনে ধরতে চায়। এটা সুমনার ফ্ল্যাট, সুমনা ডিভোর্সী এবং একা থাকে। সুমনা একটি বড় বিজ্ঞাপন সংস্থায় ভালো চাকরি করে; সুশ্রী এবং রীতিমত আকর্ষনীয়া, সজলের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে একধরনের বন্ধুত্ব মিশ্রিত প্রেম তৈরি হয়েছে দুজনের মধ্যে। সজল বিবাহিত, সজল সন্তানের বাবা; সজল নিজেও উচ্চ পদস্থ সরকারী অফিসার। সজল জানে এখনি সুমনা শোবার ঘরে আসবে না; আজ সন্ধ্যায় কাজুরী কি করছে জানতে অদ্ভুত অদম্য ইচ্ছে হয় তার। সে জানে যে এটা সুমনার ফ্ল্যাট। একটু আগে সে সুমনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল; ঘনিষ্ঠতার শেষে সুমনা বাথরুম সেরে উঠে গেছে কিচেনের দিকে; একটু পরেই এসে পৌঁছবে কোনো সুখাদ্য; এই আশ্চর্য সময়ে কেন তার ইচ্ছে হচ্ছে কাজুরীর খোঁজ নিতে, যে কাজুরীর সঙ্গে পরশু সন্ধ্যাতেই তার দেখা হয়েছে। কাজুরী কার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, কোথায় কোন্ নাটকের দলের অভিনয় দেখতে গেছে, কোন পত্রিকার সম্পাদকের নির্দেশে কোনো লেখা নিয়ে বসেছে, এসব কেন তার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে ? তার নিজের হাত তার বশে থাকে না। স্মৃতি-ধার্য নম্বরে ডায়াল করে এবং এই ভর সন্ধ্যেয় কাজুরীকে পেয়ে প্রথমটায় খুব অবাক হয় সে। "কী গো কেমন আছ ? ফেরবে না আজ ?" বলতে বলতে কাজুরীর কথা শেষ হবার আগেই সে দেখতে পায় সুমনা দুহাতে দুপ্লেট খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

"কাকে ফোন করছ এখন হঠাৎ ? — বাড়িতে ?"

চকিতে বুদ্ধি কাজ করে তার, বলে, "হ্যাঁ ছেলেটার পরীক্ষা, পড়তে বসেছে কিনা" — বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখে। মনটা খচ্ খচ্ করতেই থাকে।

বাড়ি ফেরার পথে ট্যাক্সিতে তার মনে হয় সে কেন তখন ফোনটা করতে গেল ? তার কিসের দরকার ছিল ? কাজুরীর খবরে তার কি দরকার ? হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো তার মনে একটা কথা ভেসে ওঠে, সেকি কাজুরীকে ভালোবাসে ? তা কি করে সম্ভব ? সে ভালোবাসে সুমনাকে, সে ভালোবাসে তার বিবাহিত জীবনের সঙ্গিনী নমিতাকেও। কি করে, এই জীবনের কোন ফাঁকে ঢুকে পড়ে কাজুরী ? তবে কি সুমনার প্রতি তার টান কমে গেল ? না, তা কেন হবে ? সুমনাকে আদর করতে করতে, কাল রাতে নমিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হতে তার কেন বারবার কাজুরীর কথা মনে হচ্ছে ? একি অদ্ভুত, নিজের মনোজগৎ, যা সে নিজেই জানে না ? সে কি তবে কাউকেই ভালোবাসে না ? নিজেকে জানে বলে যে অহংকার তার ছিল, তার সবটাই কি একান্তই মূল্যহীন না কি ? কীভাবে আরো একটি নারী ঢুকে পড়ে তার জীবনে ? এবং এইভাবে নিজের সঙ্গে নিজের অপরিচয়ে আরো কতবার তার দেখা হবে এ জীবনে, এক জীবনে ?

ঠেকা

গুরুদাস রায়

বাবার অসুখ। রিটায়ার্ড করার পর থেকেই হার্টের অসুখে ভুগছেন রজত বাবু। স্ত্রী অনেক আগেই মারা গেছেন। ছেলেরা সলা-পরামর্শ করে বাবাকে পি.জি. তে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে।

রজতবাবু বলেন—নিয়ে যাবো বলছো চলো, তবে এবার আর আমি সেরে উঠব না।

ছেলেরা সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। এতোদিন বাবা অসুস্থ হয়েছেন, আবার ভাল হয়ে উঠেছেন। বাঁচবেন না এ কথা কারও একবার ও মনে হয় নি। ভাবনা বাবার জন্য, ভাবনা তাদের নিজেদের জন্য।

বাবার সম্পত্তি, টাকা কড়ি কোথায় কি ভাবে কেমন করে আছে কেউ তা জানে না। জানার দরকার ও হয়নি। রজতবাবু ছেলেদের প্রত্যেককে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি স্বয়ম্ভর ছিলেন, প্রয়োজন ব্যতীত কাউকে কিছু বলতেন না।

যাই হোক রজত বাবুকে নিয়ে ছেলেরা সোজা কলকাতায় আসে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য—হসপিট্যালে ভর্তি হওয়ার আগেই হার্টের রুগী হার্টফেল করে বসেন। রজতবাবু মারা যান।

ছেলেরা বাড়ি ফিরলে বড়বৌ বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ গো বাবা কিছু বলে গেলেন ? মেজ বৌ, ছোট বৌ সবাই সাক্ষী সবুদ ছাড়াই এক একটা দাবী ক'রে বসে। খাওড়ীর চার ভরি সোনার বালা তিন বিঘে দুবের ফসলী — এ সব নাকি শ্বশুর মশাই তাদের ছেলেকে দিয়ে গেছেন। এ সবের কোন ভাগ বাটোয়ারা হবে না।

বড় ভাই সিতাংশু ভাইদের ডেকে বলে দেখ বাবার কাজ ভাল করে হওয়া চাই, কোন ত্রুটি যেন না থাকে।

টাকা পয়সার কথা উঠলে স্থির হয় টাকা পয়সা তো বাবা সঙ্গে নিয়ে যান নি। সব ঘরেই আছে। ব্যাঙ্কের বই, পোষ্ট অফিসের পাশ বুক শেয়ার মার্কেটের কাগজ পত্র সবই। লোকজন খাওয়া-দাওয়াও ভাল হবে। সব ব্যবস্থা চলতে লাগল সঙ্গে টাকা কড়ির ও। বাক্স, সুটকেস্ আলমারী সব খোলা হলো কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কিছুই পাওয়া গেল না, টাকা কড়ি না গয়না-পত্রও না শুধু মাত্র খান কতক মাসিক পত্রিকা, একখানা গীতা ছাড়া। ছোট ছেলে একটা দলিল খুঁজে পেতে বের করল যাতে লেখা আছে — আমার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাড়ি বাদ দিয়ে আমি আমার গুরুমা'র আশ্রমে উইল করে দিয়ে গেলাম। আমার মৃত্যুর পর পঃ বঃ আইন অনুযায়ী ওনারা দখল নিতে পারবেন। বাকী বাড়িটা আমার তিনছেলে ও এক মেয়ে পাবে।

ছেলেরা সব বসে পড়ল। একটা কথাও তাদের মুখ দিয়ে বের হলো না। সামনে তাদের পিতৃদায়।

দর্পণে

তুষার মুখোপাধ্যায়

বিপ্রতীপ রোজ এ পথ দিয়ে হাঁটেন। আজ হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। স্কুলের সামনে। মস্ত বড় দোতলা স্কুল গাছ দিয়ে ঘেরা। গাড়ি এসে দাঁড়ায়। মেয়েরা নামে। ক্লাশে চলে যায়।

বিপ্রতীপ চেয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। অমনি বড় বড় চোখ। ফর্সা রঙ্। স্কুল ড্রেস। অবিকল সেই মুখটা। তার মা মনির মতো। কাঁধে বইয়ের ব্যাগ। হাতে ওয়াটার পট।

— তোমার নাম কি ?

— শিউলি, হাসলো মেয়েটি। ঠিক তেমনি ফুলের মতো মিষ্টি হাসি। আর তোমার ভাল নাম ?

— মা মনি।

— মা মনি ? বিপ্রতীপ যেন দেখতে পেলেন তার সেই বিশ বছর আগের ছোট্ট মেয়েকে।

— আজই প্রথম। মেয়েটি বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে বললো— কাউকে খুঁজছেন ছোট্ট ?

বিপ্রতীপ আর কথা বললেন না। তার বুকের ভেতর ছোট্ট একটা মুখ খিল খিল করে হাসছে তখন।

কানে কানে

নিয়তি রায়চৌধুরী

—এই অদিতি।

ধৈবাধৈবির চলন্ত বাস। পিঠে কিল খেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি রুবিদি।

—ওমা তাইতো। রুবিদি যে। কতদিন পর দেখা ! আমার বিস্ময় রুবিদির নজর এড়িয়ে গেল কিনা কে জানে। আগের মতই ডেকে ডেকে বলল, কি ব্যাপার রে, শুনতে পাস না ? উত্তরে হাত চেপে ধরলাম, বললাম, পাচ্ছি তো। এই তো বলছি, কবে এলে কোলকাতা। কেমন আছ ? সৌমেনদা, টুসাই, ওরা ? রুবিদি সে কথার পাশ কাটিয়ে আমাকেই জিজ্ঞাসা করল, — কোথায় আছিস, কি করছিস এখন ?

এমন বলার কারণ, একসময় হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজেছি। অনুপমের সঙ্গে মাখামাখিটাও তুঙ্গে ছিল। পরবর্তী সময়ে বিয়ে আর ছ'মাসের মধ্যেই ডিভোর্সের কথা-টথা ভাইজাগ-বাসী রুবিদির জানার কথা নয়। তাই ছোট্ট করে শুধু বললাম, ঐ আর কি। ছোট একটা পত্রিকা অফিসে — লেখালেখার আছি। — জোকার আছিস এখন ? কে বাড়ি করল, অনুপম ? বাব্বা, এর মধ্যেই। শুনেছি জোকায় জমি-টমির এখন খুব দাম। কি রকম পড়ল রে ? বাসের কেউ শুনল কিনা ভেবে, এদিক ওদিক তাকাই। এবং রুবিদির কাঁধের কাছে মুখ নামিয়ে বলি, আমার কথা

শুনতে পাচ্ছ না রুবিদি। কোলকাতার বাইরে গিয়ে কি কানের প্রবলেমটা আরও বেড়েছে ?

হো হো করে হেসে উঠল রুবিদি, ঊর্দ্ধমুখ ফিরিয়ে বলল — হয়েছে, হয়েছে। অত আর গলা নামিয়ে কানে-কানে বলতে হবেনা। এমন কথা তুই আগেও কতবার বলেছিস — কোলাহল তো বারণ হ'ল — এবার কথা কানে কানে ...। রুবিদির গলা যেন শুনশুনিয়ে উঠল। বলল, অনুপম তোর কথা শুনতে সময় পায় তো ?

আমার স্টপেজ এসে গেছে। এই কথাটা বোঝাতে এবার আর কোনো বাক্য ব্যয়ে না গিয়ে, নীরবে বাসের সিঁড়ি ধরলাম ...।

দ্বিতীয় প্রেম

নিভা দে

বাবার বৈধব্য পালনে ছেলেমেয়েরা প্রথম প্রথম বিরক্ত হয়েছিল খুব। তারপর মেনে নিয়েছিল ক্রমে। পাঁচ বছর। পাঁচটা বছর ধরে নিষ্ঠাবান হিন্দু বিধবার মতো রথীনবাবু বৈধব্য পালন করছেন — স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর। অথচ বেঁচে থাকতে — সংসারে থাকতে — স্ত্রীকে জ্বালিয়েছেন সর্বদা, রোষ তর্জন গর্জনের ঝড় সর্বদা বাড়িতে বয়ে যেতো — বিশেষত স্ত্রীর ওপর। আর তাই একদিন মা গৃহত্যাগ করেছিলেন পাঁচ বছরের কিছু আগে। তারপর মাস দু'তিন পরে একটি চিঠি এসেছিল অজ্ঞাত পরিচয় একজন মানুষের জবানে, অমুক দিনে দেহ রেখেছেন প্রমিলা দেবী। ব্যস্ সেই থেকে পাড়ছাড়া সাদা কাপড়, স্বপাকে নিরামিষ একাহার — একাদশী, অম্বুবাচী — সব মেনে চলেছেন রথীনবাবু। তিনি তাই আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে শ্রদ্ধেয়বস্তু। তাঁর যুক্তি তিনি মারা গেলে প্রমিলাও তো এই সবই করতো। তবে তিনি কেন করবেন না ? যদিও সবাই জানে ত্রিশবছরের ঘরকন্নায় স্বামী-স্ত্রী মোটেই আদর্শ দম্পতি ছিলেন না। কাজেই এ ব্যাপারের হাস্যকরতা সবার মনে মজা সৃষ্টি করেছিল। রথীনবাবু কিন্তু অটল। সবাই আড়ালে বলে — এই কৃচ্ছ সাধন আসলে মনের পাপবোধ থেকে। হতেও পারে। অথবা — ।

প্রথমে বাড়ির পাঁচজন চমকে উঠেছিল, ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর চমকালেন রথীনবাবু অফিস থেকে ফিরে-কে ? প্রমিলা ? তুমি ? কী আশ্চর্য ।

— হ্যাঁ, তোমাদের সাজানো সংসার দেখতে এলাম, তুমি নাকি বৈধব্য পালন করছো ? ঘরিনি —

— আমিই মিথ্যে সংবাদ পাঠিয়েছিলাম —। পাঁচটা বছর শান্তিতে ছিলে তো ? আমিও ছিলাম কাশীর এক গন্ডগ্রামে। এবার সবার সঙ্গে আবার খাওয়া শুরু করো তাহলে। উনষাট বছরের এতদিনের নিরীহ প্রায় মৃত মানুষটির তেজস্বিতা আবার যেন ফিরে এলো —

— নাহ্। যা করছিলাম — তাই করবো। তোমার কথায় সব হবে নাকি ? বিধবাদের সবটা মেপে দেখছিলাম, এমন কিছু ব্যাপার নয় —।

ছেলেরা কথা তুললো — কিছু আচার, পূজাপাঠ দরকার — মৃতের ফিরে আসা এভাবে সংসারে, যদি কিছু অঘটন ...

রথীনবাবু ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন ছেলেদের দিকে শোনো, তোমরা কিছুদিন অন্যত্র বাড়িভাড়া করে থাকো যতদিন না আমরা চলে যাই — তারপর না হয় ফিরে এসো এ বাড়িতে ...।

দৃষ্টি বিনিময়ে

নিখিল ভৌমিক

বুধাদিত্য সকালে দাড়ি কাটার সময় ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ ধরে। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। মধ্যপ্রদেশ বেশ ভারী হয়ে গেছে। মাথার পিছনে বেশ বড় একটা টাক। মাথার ঠিক মাঝখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে চুল থেকে সাদা হয়ে গেছে। দু ধারে জুলফির অবস্থা তথৈবচ। গোঁফের প্রতি বুধাদিত্যর একটা দুর্বলতা আছে, তাই ফেলতে পারেন নি। সেই গোঁফও থেকে সব সাদা হয়ে গেছে। এই গোঁফ উড়িয়ে দেওয়াই উচিত। দুধু গরুর চেয়ে খালি গোয়াল ভাল, এই প্রবাদ বাক্যেও তার যেন তেমন আস্থা নেই। সব থেকেও তার মনে শান্তি নেই ।

অর্পিতা কিন্তু বুধাদিত্যকে খুব তারিফ করে। এই কাঁচাপাকা চুলের জন্যই নাকি তাকে খুব স্মার্ট আর হ্যান্ডসাম লাগে। ইন্টেলেকচুয়াল দেখায়। চুল অনেক বড় হয়ে গেছে। অর্পিতা কাটতে দেয় না। অথচ গ্লোবাল স্টাইল-ই এখন চেঞ্জ করে গেছে। খাবার টেবিলে একদিন মেয়ে বুয়া বুধাদিত্যকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করল।

ড্যাড, লুক এলিগ্যান্ট। আই লাভ য়ু।

বুধাদিত্য খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আয়নায় নিজেকে দেখছিলেন। কিন্তু বৌ মেয়ের কথায় অন্তরে সায় পাচ্ছিলেন না। আমেরিকায় শুনেছেন কেউ বৃদ্ধ হতে চায় না। যতদিন যৌবন আছে ততদিনই জীবন। ওরা জীবনটাকে উপভোগ করতে জানে। আয়নায় নিজেকে বড় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। কালারলেস। কেমন যেন ধোয়া ধোয়া। একটা নোট অব ইন্টারোগেশন-এর মত। মলিন বর্ণহীন। হ্যাত, বুধাদিত্য যেন নিজের প্রতি বিরক্তই হলেন। হঠাৎ তার মনে হল তিনি তার এই চেহারার জন্য অনেক কিছু হারাচ্ছেন। কিন্তু কি ? বুধাদিত্যর মনে হল তিনি যা হারাচ্ছেন কিন্তু ধরতে পারছেন না— সেইটাই তার বিমর্ষতার কারণ। অফিস ছুটির পর বুধাদিত্য হঠাৎ লাওডন স্ট্রীটে শাহনওয়াজের পার্লারের সামনে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। ড্রাইভারকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন।

ভাল করে চুল কাটিয়ে ওদের হায়রণ্ মেটিরিয়ল দিয়ে চুল ডাই করালেন। শ্যাম্পু করার পর চুল কম্ব করে বুধাদিত্যর সামনে আয়না ধরতেই বুধাদিত্যই যেন আর নিজেকেই চিনতেই পারছিলেন না। আয়নায় একবার নিজেকে চোখ মেরে খুশী মনে বেরিয়ে এলেন। একবার ভাবলেন ট্রিঙ্কা বা ম্যাড হাউসে একটু ড্রিঙ্ক করলে কেমন হয় । পার্ক স্ট্রীট ধরে মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে এলেন। টিকিট কেটে বুধাদিত্য প্লাটফর্মের দিকে এগোতে যাবেন এক ডাক সাইটে সুন্দরীর মুখোমুখি। মেয়েটি হেসে বলল, হাই।

— হাই। বুধাদিত্য প্রত্যুত্তর দিলেন। তারপর দুজনে বিপরীতমুখী প্লাটফর্মের দিকে ছুটলেন। ট্রেন এসে গেছে। ট্রেনটা ফাঁকাই ছিল প্রায়। বুধাদিত্য বসবার মত একটা সিট পেয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ-চুপচাপ বসেই ছিলেন। হঠাৎ সামনাসামনি অকাতেই দেখলেন বেশ সুন্দরী একটা মেয়ে তার দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল। দু জনেই চোখ সরিয়ে নিলেন। এরকম কয়েকবার তাদের দৃষ্টিবিনিময় হল। বেশ একটা সুখানুভূতি। একটা বিদ্যুৎ চমক যেন তার বুক বেয়ে নেমে গেল। বুধাদিত্য বুঝলেন তার মধ্যকার বিষন্নভাব আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক

প্রবাল দাশগুপ্ত

"বুঝলেন শৈলদা, এ লোকটা রহস্যজনক"।

"কিরকম"।

"না, ঠিক রহস্যজনক নয়, তবে সাম্প্রদায়িক বলা যেতে পারে"।

"একটু খোলসা করে বলো" —

"সময় অসময় নেই, বাড়িতে টেপ বাজিয়ে রামধুন শোনে"।

"তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। তাহলে গান্ধীজীকেও সাম্প্রদায়িক বলতে হয়। আর পালুসকার'এর গাওয়া হলেতো কথাই নেই। অনবদ্য"।

"বাঙালীর ছেলে অথচ হিন্দী মিশিই ওর বেশি পছন্দ"।

"শুনলাম । আর কিছু"। মাঝে মাঝেই হিন্দীতে ছড়া কাটে। আর মধ্যে রামচন্দ্রের কথাও থাকে। হিন্দীটাও কিরকম ত্যাড়াব্যাঁকা"।

"সর্বনাশ, তাহলেতো দেখছি লোকটা বিশেষ সন্দেহজনক। বোধহয় হনুমান চল্লিশা থেকে আবৃত্তি করে। কিন্তু ছড়াটা শোনা দরকার"।

"একটু অপেক্ষা করুন, আওড়াল বলে — ওই শুনুন"।

দূর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে

'কেয়া কাশী কেয়া উসর মঘর,
রাম হিরিদয়ে বাস মোরা
যো তনতীজে কবীরা,
সায়ে কৌন বনুরা'

শৈলদা, কিছু বুঝলেন"।

আমি বাবু। সেলাম। ছেলেটা চলে গেল ট্রলি নিয়ে। আমি খুব মাংসের ভক্ত। প্রায় খাই। এবার থেকে খাবার সময় ঠিক ঠিক খেতে পারবো তো ?

কবির চোখে

বিষ্ণুপদ বিশ্বাস

ছবি তোলবার অদ্ভুত নেশায় মেতে থাকে কান্তদাস। আমার বন্ধু। আমাকে এক এক সময় ডেকে দেখায়ও। সেদিনও ডেকেছিল। অগ্রাহ্য করবার মত নয়। গেলামও। নানান ধরণের সব ছবি। ছবির বাঁপি। এক-একটা বের করে দেখাতে থাকে। টেবিলে চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠছে। প্লেটে সাজানো সিঙ্গাড়া।

— জানো এগুলো গোয়ার সী বীচে তোলা।' বলে কান্ত। এক এক জোড়া অদ্ভুত আদিম নরনারী। আসন্ন কামনা চিত্ররূপ।

— এগুলো পুরি মন্দিরের।' দেহকল্প বিলাসের নিখুঁত কারুকার্য।

— টাইগার হিল থেকে সূর্য ওঠা দেখেছো কখনো ? এই দ্যাখো। পৃথিবী ফুঁড়ে সূর্য উঠছে কেন। নতুন সূর্য।

একটা সিঙ্গাড়া তুলে আমি অর্ধেকটা মুখে নিয়ে চিবোতে থাকি। গরম। এক এক করে ছবি বের করতে থাকে কান্ত। নদীর চরে হাড় জির জিরে এক দল বুড়ো, বৌ, বাচ্চা দু হাতে বালি খুঁড়ে চলেছে। ঢেউ আছড়াচ্ছে অদূরে।

— সোনা খুঁজছে, সোনার সঙ্গে সৌভাগ্য।' বলে কান্ত। আমি চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকাই। 'বেশ তো তুলেছো।' আমি এগুলোকে শিল্প বলি না। বলি, সাক্ষাৎ বাস্তব। চোখের দেখাটাকে ধরে রাখা। তবু বেশ।

— হ্যাঁ, বেটা তোমাকে দেখানোর জন্যে ডেকে আনা,' বলতে বলতে সে বের করে অন্য একটা। 'এটাকে মিরাক্যাল বলতে পারো।' আগুনে বইকেনা পুড়ছে।

— এ ছবি তুমি কোথাও পাবে না।' মাথা নাড়ে কান্ত, কেউ বোধ হয় দেখাতেও পারবে না। কলকাতার দু'একজন সাংবাদিক যদি'—মুখে প্রচ্ছন্ন গর্ব, দাউ দাউ আগুন। অনির্বান জ্বলছে যেন।

"বুঝলাম" ।

"লোকটা কি রামভক্ত নাকি"।

"বলতে পারিনা। তবে ওটা কবীরের একটা দোঁহা — কবীর বলছেন কাশী কিংবা উষর অনুর্বর মঘর — যা গোরখপুর জেলার অখ্যাত একটা শহর, যেখানে কবীরের মৃত্যু হয়, এ দুইই আমার কাছে সমান, কেননা আমার হৃদয়ে রামচন্দ্রের বাস, যদি শুধুমাত্র কাশীতেই কবীরের আত্মা তনতিজে অর্থাৎ তনু ত্যাগ করে মোক্ষলাভ করে, তবে আর রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য কোথায়"।

"বেশ ধর্মিষ্ঠ আছে তো ? একে কি সাম্প্রদায়িক বলা চলে"—

কবীরকে সাম্প্রদায়িক ঠাউরালে সারা ভারতবর্ষে অসাম্প্রদায়িক লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে ভাই। (গল্পকার ছড়া বানান 'ছরা' লিখেছিলেন সংশোধন করা হল। সম্পাদক)

কসাই

বাদল ঘোষ

বাড়ীর কাজ হবে। পুরাতন বাড়ী। অনেকদিনের। মাঝে মাঝে সারাই এর টুকটাক কাজ করতে হয়। হার্ডওয়ার দোকানে বলে এসেছি। কিছুক্ষণবাদে একটা ছেলে ট্রলি করে সিমেন্ট পৌঁছাতে এল।

এই ছেলেটা নতুন। আগে যে ছেলেটা সিমেন্ট দিতে আসত, সে নয়। সিমেন্ট নামান হল। ওকে ওর ভাড়া মেটাতে গেলাম। তখন ছেলেটাকে পরিচিত লাগল। বললাম — তোমাকে চেনা চেনা লাগছে। ছেলেটা বলল — হ্যাঁ বাবু আপনি যে দোকানে মাংস কেনেন, সেখানে আমি কসাই ছিলাম।

— তা সে কাজ ছেড়ে দিয়ে এ লাইনে ? ট্রলি টানা তো খুব কঠিন কাজ। কষ্টের ব্যাপার।

— বাবু, শুধু শুধু দুটো পয়সার জন্যে ছাগল মুরগীর গলা কাটা প্রতিদিন, বড় পাপের কাজ। রাত্রে ঘুম হতো না। কাজ ছেড়ে দিলাম। এখন গতর খাটিয়ে রোজগার করি, ভাত খাবার সময় আর মন খারাপ করে না। আচ্ছা

আমি বলি, এ আর এমন কি ? এতে ঘাবড়ানোর। বরং আগের গুলো—

মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে কাত্তর। চোখে, মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে, সে কি ! দেখো। ভাল করে দেখো। এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আগুনের ভেতর থেকে উঠে আসছে। মানুষের সৃষ্টিকে রক্ষা করতে বাড়াচ্ছে দু হাত। মা ভৈঃ, মা ভৈঃ।

আমি বলি, এ তোমার কল্পনা — মনগড়া।

ও বলে, এটাই শাশ্বত। ধ্বংসে কি শেষ কথা হতে পারে ? মাথার ভেতর একটা কথা তখন উসখুস করে ওঠে। আমি কাত্তকে সে কথা বলতে পারিনে-কিছুতেই বলতে পারিনে, আমি কবি নই।

পাগলা ডাক্তার

বিধান মজুমদার

ডাক্তারবাবু আছেন ? রামকানাই গলাটা একটু শানিয়ে নিয়ে বলল।

— তিনি আছেন। তবে মেয়ে পড়ে আছেন। মাথাটা খারাপ হবার জো। এখন তিনি রুগী দেখবেন না। ঘন্টা খানেক পরে আসুন।

দরজাটা হাট করে খোলা ছিল। কে যেন ভেতর থেকে মুখ না দেখিয়েই চিৎকার ক'রে ব'লে দরজাটা দড়াম্ করে বন্ধ করে দিল।

রামকানাই বাইরে দাঁড়িয়ে গজর গজর শুরু করল। এইজন্যই লোকে বলে ডাক্তারের মাথায় ছিট্ আছে। বাইরে কোনও সাইন বোর্ড নাই, চেম্বার বলতে ডাক্তারবাবুর নিজের শোবার ঘর, ঘরের এক কোণে ডাঁইকরা ওষুধপত্তরের শিশি বোতল, আর এক কোণে গুচ্ছের খানিক ভাঙ্গা চেয়ার টেবিল, তাতেই সিরিয়াস পেশেন্টরা বসে ডাক্তারবাবু ঘরের মাঝে পাঠশালার পন্ডিতের মধ্যে কখনও দাঁড়িয়ে কখনও বসে দু'বার কথা বলে তিন পুরিয়া কি দু পুরিয়া ওষুধ দেন। তাতেই ফিফটি পারসেন্ট রুগীর কাজ হয়। রামকানাই সে কথাই নানান জনের কাছে শুনে এসেছে। দুরারোগ্য ব্যাধির নাকি ধন্বন্তরি চিকিৎসা।

আজ নিয়ে পনের দিন হ'ল রামকানাই কোনও ওষুধ পায় নি। এই বেলা তিনটে সাড়ে তিনটেয় যখন তিনি কোনও রুগীই দেখেন না তাকে আসতে বলেন। রামকানাই আসে, রোজই ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলে ডাক্তারবাবু আছেন, ওষুধ মেরে পড়ে আছেন, ঘন্টা খানেক পরে আসুন। শহর থেকে অনেকটা দূরে এই সেরকম রাস্তার দু'পাশে জনবসতি কম, গাছপালাই বেশি, এইসময়ে পথ চলতি মানুষও চোখে পড়ে না। চারদিকে থমথমে। আকাশ্যার মত অন্ধকার। অগত্যা রামকানাইকে গাছের ছায়ায় বসে ঝিমুতে হয়। রামকানাই-এর খারাপ লাগে না। আধবোজা চোখে ডালপালার নড়াচড়া দেখে, পাতার ফিরফির কাঁপন দেখে, পাতা দুলছে, ডাল দুলছে। ঝাঁক ঝাঁক পাখির কিচির মিচির লাফালাফি দেখে। রামকানাই জোরে জোরে শ্বাস টানে, ঝুরঝুরে হাওয়ায় ভেতরটা সবুজ হচ্ছে মনে হয়।

আজও রামকানাই সেই যে এসে বসেছে উঠতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে সে বোধহয় নিজেকে ফিরে পাচ্ছে। হারানো স্মৃতিগুলো ঘুরে ফিরে চোখের সামনে ভাসছে। এখন চোখের সামনে দুর্ঘটনায় নিহত ছেলে ও মেয়েকে দেখছে।

— এই যে মশাই, আপনি আচ্ছা লোক তো, আপনি সিরিয়াস ভেবে আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম।

রামকানাই দেখছিল তার দশবছরের ছেলে ও সাত বছরের মেয়েকে নিয়ে পার্কে ঘুরছে। আচমকা পেছন থেকে ডাক্তারবাবুর ডাকে ও ধড়মড় উঠে পড়ল না। বলল, আর কি শান্তি ডাক্তারবাবু এখানে। আপনিও একটু বসুন। অনেকটা হেঁটে এসছেন একটু জিরিয়ে নিন।

মিনিট পনেরো বাদে ডাক্তারবাবুর ঘরের সামনে রামকানাই আর ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়ে। কলিং বেলে চাপ দিয়েও কেউ দরজা খুলল না। কে যেন ভেতর থেকে বলল, আরও ঘন্টা খানেক ঘাটেমাঠে ঘুরে এসো, তারপর দরজা খোলা যাবে।

কোথায় যেন রহস্য, রামকানাই ডাক্তারবাবুর দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। ডাক্তারবাবু দূরের একটা বটগাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, চলুন ওখানে গিয়ে একটু বসি, এ সময়ে প্রচুর পাখি এসে ওখানে বসে। মানুষে সঙ্গে কথা বলে। বলেই ছলছল চোখে বললেন, আমি ও আপনার রোগে ভুগছি। একই বছরে বাবা মা ভাইবোনকে হারিয়ে ভয়ংকর নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলাম। একটু অবসরেই বুকের মধ্যে শোকের তাপ রক্তমাংসের দখল নিচ্ছিল। মাথা ঠিক রাখতে পারছিলাম না। ঐ সবুজ গাছপালা, পাখির ডাক, আমার সঙ্গে ওদের বোকাপড়ার কথাবার্তা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আপনিও বোধহয় এই ক'দিনে ... , হাঁটতে হাঁটতে বটগাছের কাছাকাছি এসে গেছে। রামকানাই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ডাক্তারবাবু, কে যেন আমাকে ডাকছে বা-বা বলে, ঠিক আমার ছেলের গলা। ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বললেন কে আবার ঐ পাখিরাই — ডালে ডালে বসে সুর বাঁধছে। দেখছেন কি সুন্দর ডাকছে ডা...ক্ত...র...বা...বু... রাম...কা...না...ই... ।

একটি স্পনসর্ড গল্প

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প লেখার বিষয় যেদিন বদলে যাবে ওয়ান ডে ক্রিকেটের মতো। বেটিং চক্রের মাঝখানে পড়ে গল্পও যেদিন হাসফাস করবে। একটি গল্পের মধ্যে দু'ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা থাকবে কোন এক বহুজাতিক সংস্থার বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনে। প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা ব্যবহার করবে বিভিন্ন কোম্পানীর লোগো। ঠিক সেরকমই কোন একদিন দীপ্ত গল্পটা লিখছিল একটি প্রতিযোগিতার জন্য। লিখছিল অদ্ভুত এক লগ্ন যা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারবেনা। ঠিক তখনই ফোনটা এল। উড়ো ফোন যেমন আসে প্রতিদিন। যেমন ভাবে আজকাল অনেকেই তাকে বিব্রত করে।

— হ্যালো। দীপ্ত বলল

— চিনতে পারছেন ?

চিনতে না পারলেও গলাটা পরিচিত শোনাল। একটু গম্ভীর হয়ে দীপ্ত বলল: বলুন।

— বুঝতেই পারছেন কি বলতে চাই।

— না পারছিনা।

— ইন্টার নেটে জানতে পারলাম আপনি একটি মারাত্মক গল্প লিখছেন সেটা প্রতিযোগিতায় জন্য পাঠাবেন না। পরিবর্তে একটি বাঁ হাতের লেখা জমা দেবেন।

— আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

— বোঝার দরকার নেই; কথা মতো কাজ হলে আপনার অ্যাকাউন্টে পাঁচ লাখ টাকার চেকটা পাঠিয়ে দেব আর —

— আর —

— আপনার পত্রের গল্পটা আমরা স্পনসর্ড করব। বলে ফোনটা কেটে গেল।

কলমটা অনেকদিন আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু মাথাটা; মাথার ভেতরে অঙ্কুরিত ইচ্ছেগুলোও কি বিক্রি হয়ে যাবে আজ ? দীপ্ত জানে — এ এক অশ্লীল প্রতিযোগিতার যুগ। আজ কেউ আর সৎভাবে লেখে না। অর্থের জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপনের ভাষায় কথা বলে কবিতা বা গল্প গুলি। দীপ্ত মাথা চুলকোয় — সে কি করবে ? অসাধু বেটিং চক্রের কাছে মাথা নুইয়ে দিয়ে অন্যকে প্রথম হওয়ার সুযোগ করে দেবে ? নিজেকে ক্রীতদাস করেছে অনেকদিন। শেকল অলংকার ভাবার অহংকার আজ তার নেই। সে নিজেকে স্বাধীন, মুক্ত লেখক বলে ভাবতে শিখল আজ এই প্রথম। সে চেঁচিয়ে উঠল — এ শেকল ছিঁড়ে ফেলো। স্বাধীন আকাশে আমি উড়বো। সবাই বুঝল দীপ্ত পাগল হয়ে গেছে।

রূপকথা

বীরকুমার শী

রাজামশায় বেরিয়েছেন রাজ্য পরিদর্শনে, সৈন্য নেই, সিপাই নেই, মন্ত্রী নেই, পারিষদ, সভাসদ — কেউ নেই। চাষী ধানগাছ পিটাই করছিল, রাজামশায় বসে পড়লেন — ধানের গাদার উপর। চাষীর মেয়ে ছুটে একটা

কলাগাছের ডাঁটার আসন নিয়ে এল, রাজামশায় বললেন, দরকার ছিল না। ধানের গাদা বেশ ভালো গদি। নিজের হাতে আসন নিয়ে ধানের গাদার উপর বসলেন। খবর নিলেন — ধান কেমন হয়েছে। চাষী বলল : তা আপনার বাপ-মা'র পুণ্যে মন্দ হয় নি। খাবার সময় হল।

চাষী বলল : হাতমুখ ধুয়ে নিন রাজামশায়। একটু মুড়ি খেয়ে নিন, সেই কোন সকালে বেরিয়েছেন।

রাজামশায় দেখলেন মন্দ নয়। একটু মুড়ি খেয়ে নিলে আরও দু'ঘর ঘোরা যাবে। দু'জনের সঙ্গে দেখা করা যাবে।

রাজামশায় বললেন, তুমি খাবে না ?

চাষী বলল : আমি পান্তা খাব।

রাজামশায়ের মন উসখুস করতে লাগল, কতদিন পান্তা খাওয়া হয় নি। শীতের সকালে বড়ি বেগুনমলা দিয়ে পান্তা খেতে দারুন লাগে। রাজামশায় বললেন — কি দিয়ে পান্তা খাবে হে ?

—বেগুনমলা আর শাকভাজা, ঐ আর কি ?

— আমাকে বরং পান্তা দাও। বেগুনমলায় একটু বড়ি মিশিয়ে দেবে তো ?

চাষীবউ কুঁড়াজালি বসিয়েছিল, কয়েকটা কুচোচিংড়ি ধরে ছিল তাতে। কুচোচিংড়ি ভেজে, পেঁয়াজ দিয়ে ছেঁচে নিল চাষী বউ, বড়ি দিয়ে ভালো করে বেগুন মলল। সুপানি শাকভাজা হয়েছিল — বাটিতে শাকভাজা দিল,

রাজামশায় ঝড়ে খেলেন।

খাওয়ার পর ধানের গাদাতে একটু গা এলিয়ে দিলেন, বড় মিঠা রোদ। আহা, এমন দিন সত্যি কবে আসবে। (লেখককে আধুনিক ও চলিত বানান গ্রন্থ করতে হবে। আদ্যিকালের পুরোনো ও অপ্রচলিত বানানে সুন্দর এই গল্পটির প্রাণভোমরা নষ্ট করে ফেলেছেন। সম্পাদক, কফি হাউস)

তিন্নির মা

মঞ্জুলা ভট্টাচার্য

গত বছর প্রমোশন পরীক্ষায় দু'নম্বর মার্কের পিয়া ফার্স্ট হয়েছে। এবার যাতে তিন্নি হয় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা তনিমার। তিন্নির এবার ক্লাস টু। সামনে থ্রি। তনিমা

মেয়েকে বোঝাচ্ছে। "সব ভাল করে লিখবে। মাথা-ঠান্ডা করে প্রশ্নগুলো পড়বে। সব প্রশ্নের উত্তর দেবে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, বলবে না বুঝেছ ? — মাথা নেড়ে তিন্নি বলে ঠিক আছে।

— সবগুলো পড়া মনে আছে তো ? এবার ও মাথা কাত করে "হ্যাঁ" — বলে তিন্নি।

তনিমার সারাদিনের বেশিটাই মেয়ের পিছনে কাটে। ভাল রেজাল্ট না হলে পরে অন্য স্কুলে ও ভর্তি করতে পারবে না। স্কুলে ভর্তি করা এখন একটা পাহাড় সমস্যা।

— সব গুছিয়ে নিয়েছ তো ? কলম, পেন্সিল, রবার, রংয়ের বাক্স। বলতে বলতে তিন্নির ব্যাগে টিফিন কৌটার তনিমা হাত দিয়ে একটু দেখে নেই ব্যাগটা।

বেসিনের আয়নায় দাঁড়ি কামাচ্ছিল অজয়। তিন্নির করুণমুখ আর তনিমার ক্রমাগত এটা করবে না, ওটা করবে না, এটা করবে, ওটা করবে শুনতে শুনতে এবার অজয় বলল — তিন্নির মাথাটা তুমিই ঘুরিয়ে দিচ্ছ।

— বাজে বকো না তো। কিছুই তো করো না মেয়ের জন্য। সারাদিন অফিস। অফিসের পর টিভি, গল্পের বই, নতুবা ঘুম।

— রাগ করছো কেন ? শান্ত গলা অজয়ের — "আসলে পরীক্ষার সময় এতো বললে ওর পক্ষে কোনটা মনে রাখবে সেটা মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে, তোমার কথা না পরীক্ষার পড়া।"

বিছানা ঠিক করতে করতে তনিমা বলে — তোমার আর কি ? সংসারে টাকা কটা ফেলে দিয়েই খালাস। সারাটা মাস চরকি বাজি আমার করতে হয়। ইলেকট্রিকের বিল, ফোনের বিল, কলের মিস্ত্রি, দোকান-বাজার, মেয়ের স্কুল, ডাক্তার, ঘর সব, সব কিছু।

অজয় বুঝতে পারে তনিমা খটিতং। দাড়ি কামিয়ে চলে চুপচাপ।

— মা স্কুলের গাড়ী এসে গেছে

— চলো-চলো, জুতোটা কোথায় পরে নাও। ব্যাগে সব নিয়েছ তো ? তনিমা আবার ব্যাগটা দেখে নেয়।

খাতা, স্কেল, পেন্সিল কলম, রবার, রংয়ের বাক্স কোথায় ? দেখেছ যেটা না দেখব সেটাই ভুল। রংয়ের বাক্স ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে তনিমা তিন্নিকে বলে আরেকটা কথা শোনো — কাউকে টিফিনের ভাগ দেবে না সব একা খাবে। আর কোন বন্ধু যদি তোমার কাছে পেন্সিল, কলম, রবার কোন কিছু চায় একেবারে দেবে না।

— চাইলে কি বলব মা ?

— বলবে তোমার কাছে নেই।

তিন্নি বিস্ময় মাখা চোখে মাকে দেখে।

পরাজিত শিল্পী

মুনমুন রাউত

কাকে চান ? প্রশ্নটি শুনে মনীষার চেতনা ফিরে এলো। ফেলে আসা দীর্ঘ ছ-সাত বৎসরের স্বপ্ন সুন্দর দিনগুলোর মধ্যে সে কতক্ষণ ধরে বিচরণ করছিল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেও জানে না। অজান্তে কলিং বেলে হাত পড়ে প্রশ্নটি শুনে চেয়ে দেখে খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সীমান্তে সিঁদুরপরা এক নববধূকে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকিয়ে। মনীষা মুহূর্তের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে যায়। স্বপ্নের সুন্দর দিনগুলোতে হঠাৎ বিষাদের ছায়া নেমে আসে। বাক্যজ্ঞান লোপ পায়। প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বুক ফাটা আর্তনাদ নিয়ে মনীষা রাস্তার দিকে পা বাড়ায়

একদিন মনীষের বুকভরা ভালবাসা নিয়ে মনীষা সুদূরদেশী প্রবাসী হয়েছিল। হারিয়ে গিয়েছিল কয়েকটি বৎসর। আজ মনীষা ফিরে ছুটে এসেছিল মনীষের কাছে কিন্তু একি করল মনীষ ? তার সব প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হয়ে গেল ? তবে কি সবই ফাঁকি ?

মনীষার মনে হল শুধু একটা সামাজিক স্বীকৃতি মানুষের অধিকার ও দাবিকে কতখানি বাড়িয়ে দেয় ভাবতে অবাক লাগে। আর তার বাইরে যে স্বীকৃতি, যেমন মনের স্বীকৃতি, দেহের স্বীকৃতি, বিবেকের স্বীকৃতি সব মূল্যহীন হয়ে যায় সমাজের ব্যবধানে।

ঈশ্বর যে পরাজিত শিল্পী অঙ্কন করেছে, তার দু'চোখে কালো হরিণীর কাজল অঙ্কিত করেছে, তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা নীরব অশ্রুকে কেউ কোনদিনও দেখেনি। কেউ শুনতে পায় না বিন্যস্ত কালো কেশের পিছনে লুকিয়ে থাকা হৃদয়ের কান্নাকে। সুন্দর কেশভূষায় ঢাকা হৃদয়ের ক্ষতকে, রং লাগান ঠোঁটের অন্তরালে বিষাদের ছায়াকে।

যদি ঈশ্বর পরাজিত শিল্পীকে বিরহ বেদনায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করত অথবা ভারসাম্যহীন অথবা পতিতা পল্লীর কোন নারীকে অঙ্কিত করত তা হলে অনেক মনীষা সমাজের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত। কিন্তু মনীষার তা হয়নি তাই তার মনের ক্ষতকে কেউ কোনদিন উপলব্ধি করতে পারেনি।

নয়ন-সরসী

রাত্রি বসু

— এই তোমার পাঁচটা ? ইস্।

— মাফ চাইছি, আর হবে না। লো-এর দেরি আছে। চল ওধারে যাই। পথে যেতে যেতে তনু বলে, জানো আমার পাশে যে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, উনি এতক্ষণ গল্প করছিলেন। ওদের দেশে মানে রাজস্থানে স্বামী মারা গেলে, তার যদি সন্তান না থাকে, সে বাপের বাড়ির দেওয়া যৌতুক নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতে পারে।

— তাই, তনু তুমি নিশ্চয়ই জানো রূপ কানোয়ারের কথা। অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা ও ভাল ব্যবহার — দুটোই সব জায়গায় আছে। কাল তোমার ট্রেন ক'টায় ?

— রাত ৮টা। চলো সিনেমা শুরু হয়ে যাবে।

দীর্ঘ ছ'মাস বাদে তনুশ্রী নিগ্রী থেকে ফিরে, বাড়ি ঢুকতেই যেন তনু বলে ওঠে, বিশাখাদির কাল বিয়ে। এই ন্যাপ কার্ড দিয়ে গেছে।

তনু এক পলক চোখ বুলিয়ে নেয়, কাল বিকেল ৪টেতে রেজিষ্ট্রি হবে।

পরদিন একটু দেরি হয়ে যায় তনুর। বিশাখার বাড়ি যেতে। সে যখন ঢোকে তখন সিঁথিতে সিঁদুর

মন্তব্যের পালা। কিন্তু ও কে ? ইন্দ্রনীল না ? তনুর বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠলো। ইন্দ্র আজ সম্পূর্ণ আর একজনের হয়ে গেল। তার ওপর আর অধিকার নেই একটুও। এতদিন তাকে নিয়েই ছিল যত সুখ, দুঃখ, কামনা, বাসনা। না, তবু একটুও ভেঙে পড়লো না। অন্তরের দুর্জয় অশ্রুপাতকে চেপে রেখে অপলক চোখে চেয়ে থাকলো ইন্দ্রের প্রতি। মনে পড়লো সেই কথাটা নিষ্ঠুরতা ও ভাল ব্যবহার সব দেশেই আছে।

পুনরভিনয়

রাণা চট্টোপাধ্যায়

আপনার ছেলের সঙ্গে আমার থাকা আর সম্ভব নয়, সারাক্ষণ মা' ছেলে মিলে ফুসফুস-ফিসফিস করে আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিলেন। — একথা বলে সুচারু সান্যাল গটমট, গটমট করতে করতে দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে সজোরে দরজা বন্ধ করে দেয়। ক্ষণপ্রভা দেবী পুত্রবধূর চলে যাওয়ার দিকে হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে থাকেন। ক্ষণপ্রভাদেবীর বয়স হয়েছে। স্বামী পুরোনো আই-এ-এস। একমাত্র ছেলে সুমন্তও আই-এ-এস অফিসার। বর্তমানে কলকাতার পাশের জেলার ডি.এম, তখনও ফেরেননি। বছর পাঁচেক আগে ক্ষণপ্রভাদেবী দেখে শুনে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বঙ্কিমনাথ ভাদুড়ীর একমাত্র বিদুষী কন্যার সঙ্গে সুমন্তর বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে দেখতে শুনতে ভাল। উত্তর কলকাতার লেডিজ্ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপিকা। অথচ মাস ছয়েক পর থেকেই তিনি দেখছেন সুচারু'র মতি-গতি কেমন কেমন। তিনি যা বলেন সুচারু শুনেও শোনেনা। তিনি নিজেও ভাল চাকরি করেছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন। সাধারণ ঘরের শাশুড়ির মতন তিনি হবেন না, জানতেন, তবু পুত্রবধূর এ হেন ব্যবহার অকে যথেষ্ট আহত করে। অন্য দিন হলে তিনিও রেগে ট্যাক্সি ডেকে সুইন্‌হো স্ট্রিটে বাপের বাড়ি চলে যেতেন। কিন্তু এখন সুইন্‌হো স্ট্রিটে থাকে ভাইপোরা। দুই দাদা মারা গেছে। বাবা-মা'ও নেই। ফলে ক্ষণপ্রভা দেবী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে টি-ভি'র রিমোট এর লাল বোতামটা টেপেন। হিন্দি গানের সঙ্গে অর্ধ উলঙ্গ ক'টা মেয়ে নাচছে। রিমোট বন্ধ করে দেন। পাশের ঘর থেকে পঁচাত্তর বছরের প্রাক্তন আই-এ-এস অফিসার রাঘবেন্দ্র সান্যাল এসে ডিভানে বসতেই, ক্ষণপ্রভার রাগ হলো, মনে হলো পুত্রবধূর কথাগুলি শোনার পর বুড়োটা মজা দেখতে এসেছে। খুব আনন্দ। বউকে কেউ অপমান করলে খুব খুশি হন। — কি হলো ক্যাকক্যাক ক'রে হাসছো যে ?' রাঘবেন্দ্র বলেন — কই হাসলুম ? বউমা রাগ দেখিয়ে গেল কেন ? কি হয়েছে ? — জানিনা যাও। আদিখ্যেতা হ'চ্ছে ? শুনতে পাওনি ? রাঘবেন্দ্র বলেন — হ্যাঁ শুনলাম বটে। তবে মনে হলো চল্লিশ বছর আগে ফিরে গিয়েছি। ক্ষণপ্রভা ভুরু কুঁচকে তাকান — মানে ? — মানে জনৈকা ক্ষণপ্রভা সান্যাল অফিস থেকে ফিরে তাঁর শাশুড়ি লাবণ্য প্রভাকে বুঝি বলছে — আমি আর থাকতে পারবো না। সারাক্ষণ মায়ে ছেলেতে ফিসফিস চলছে, তারপর ছেলে ফিরেই আমায় হম্বিতম্বি করবে। না, না, আমি কাল সকালেই সুইন্‌হো স্ট্রিটে চলে যাব।

ক্ষণপ্রভা হেসে ফেলেন — সত্যি সে সময় অফিস থেকে ফিরে তুমি মা'র সঙ্গে এ্যাতো কি ফিসফিস গুজগুজ করতে বলতো ?

রাঘবেন্দ্র সান্যাল বলেন — তুমিই বা সুমন্তর সঙ্গে এ্যাতো কি ফিসফিস গুজগুজ করোগো ? ক্ষণপ্রভা বলেন — এমনি মামুলি কথা। কোন মানে নেই।

রাঘবেন্দ্র বলেন — বউমা কিন্তু অন্যরকম ভাবে। যেমন চল্লিশ বছর আগে তুমি ভাবতে। ভাবতে না ?

— সত্যি খুব বোকা ছিলাম।

তিরিশ বছর পর বউমাও সুমন্তকে একই কথা বলবে।

গল্পকারকে গল্প বানানের দিকে নজর দিতে হবে। পুনরভিনয় বানান তিনি 'পুনরাভিনয়' লিখেছিলেন, সংশোধন করা হল।

সম্পাদক ঃ কফিহাউস

টাটা স্টিল

রামকৃষ্ণ মণ্ডল

বসন্তবাবু ক্যাশবাক্স ছেড়ে উঠতে পারছিলেন না। পুজোর মুখ, প্রচণ্ড ভীড়। সাতজন সেলস্‌ম্যান খদ্দের নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। চালু কাপড়ের দোকান 'বসন্ত বাহার'। বড়ছেলে পান্না এল বাবাকে জলপানের রিলিফ দিতে। উনি উঠে দোতলায় গেলেন; দেখলেন স্যুটেড বুটেড এক কিশোর তার ছোটছেলের সঙ্গে বসে ডিসভর্তি মিষ্টি সাবড়াচ্ছে।

বসন্তবাবুর চোখ কুঁচকে গেল। বিরক্তি চেপে বললেন— এটা কে রে হীরে।

— আমার বন্ধু পলাশ, বাবা। একসঙ্গে বিদ্যাভবনে পড়ি।

— কই আগে তো দেখিনি ?

— না বাবা, ও সবে একমাস হলো, বহরমপুর থেকে এসেছে।

— ওঃ। বসন্তবাবুর বলার ইচ্ছে ছিল, একগাদা মিষ্টি খাইয়ে আদিখ্যেতা না দেখালেই কি হতো না ? বলা হলো না; তার আগেই তার হীরের পাশে রাখা একটি সুদৃশ্য রেক্সিন মোড়ক থেকে একটি ফোল্ডিং ছাতা বের করে বলল — বাবা দেখো কি সুন্দর !

বলেই ছাতার সুইচ অন করে দিল। একটি মৃদু শব্দের সঙ্গে ছাতা খুলে গেল। সুদৃশ্য বাহারী ছাতা, হালকা ময়ূরকণ্ঠী নীলরং চোখের সামনে চিকচিক করে উঠল।

হীরের হাত থেকে ছাতাটি নিয়ে বসন্তবাবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন, ছাতার কাপড়ে সোনালী রঙের লেখা — 'টাটা স্টিল।

বসন্তবাবুর মুগ্ধতা কথা হয়ে ঝরল — বাঃ বেশ তো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বসন্তবাবু ছেলেটিকে মেপে নিয়ে বললেন — কি হে এত সুন্দর ছাতা কোথায় গেলে ?

— আমার বাবাকে কোম্পানী থেকে দিয়েছে।

— তোমার বাবা বুঝি টাটাস্টিলের অফিসার ?

— না, না, আমার বাবা রাজমিস্ত্রি।

— হ্যাঃ, হীরে, একটা রাজমিস্ত্রির ব্যাটাকে একগাদা মিষ্টি খাওয়াচ্ছিস ? আর বন্ধু পেলিনে ?

হীরে ব্যগ্র হ'য়ে বলল — বাবা পলাশ ছাতাটা আমাকে দিয়েছে।

পলাশ ততক্ষণে কাঁচুমাচু, প্লেটে অর্ধভুক্ত মিষ্টান্ন ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, চলে যেতে।

বসন্তবাবু একগাল হেসে বললেন — তাহলে বসো খোকা। মিষ্টিগুলো খাও।

অসতর্ক বানান ভুল সংশোধন করা হল।
সম্পাদক : কফিহাউস

নয়নারাধনে

রূপশ্রী দত্ত

রামবাবু শখ ক'রে নার্সারি থেকে আনিয়ে ফুল ফলের গাছ লাগালেন। গোলাপ, জবা, যুঁই, বেল এর পাশাপাশি বাতাবীলেবু, কাগজীলেবু, লঙ্কাও বাদ গেল না। প্রথম জুঁই বেল ফুটতেই রামবাবু সেগুলি চয়ন করে তাঁর ইষ্টদেবতার চরণে অঞ্জলি দিলেন। ছবির মত ফোটা গোলাপগুলি তুলে ফুলদানীতে রাখতে ইচ্ছে করে না। দু চোখ ভ'রে দেখে ভাবেন যদি চিত্রকর হতেন, তাহ'লে রঙ, তুলি, কাগজ নিয়ে ব'সে বস্তুর প্রতিরূপ স্টিল লাইফ এঁকে ফেলতেন। একমাত্র ছেলে ব্যাঙ্গালোরে পড়াশোনা করে। স্ত্রী শিক্ষিকা ছিলেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত। রামবাবুর অবসর জীবনে ফুল ফোটানো ফল ধরানোর খেলায় মেতেছেন। স্ত্রী, সুরলক্ষ্মীর সময় কাটে বই প'ড়ে, টিভি দেখে। বৃক্ষচর্চা তাঁর ধাতে নেই। রামবাবু গাছের কাগজী লেবু, লঙ্কা উদ্ভাসিত মুখে স্ত্রীকে দেখান। স্ত্রী বিচিত্র হেসে বলেন — তবে আর কি। তোমার লেবু, লঙ্কার খরচটা অন্তত বাঁচল। রামবাবু বলেন — সব কিছুই কি জমা খরচ আর লাভক্ষতি দিয়ে মাপা যায় সুরো সৌন্দর্য বোধটাই বড় কথা। 'থাকো তুমি

তোমার সৌন্দর্য্যবোধ নিয়ে'। — আবার বইএর পাতায় চোখ রাখেন সুরলক্ষ্মী। অচিরেই দেখা গেল ফুল ফল বেহাত হয়ে যাচ্ছে। কাঁটাতারের বেড়া এড়িয়ে দুপুরবেলা ছেলেদের 'অপারেশন রামবাবুর বাগানে চলে। রামবাবু মনকে বোঝান 'আমি তো অস্কার ওয়াইল্ডের সেলফিশ জায়েন্ট হতে পারি না। ওরা কচিকাঁচা — নিচ্ছে নিক। সুরো বললেন — 'হ্যাঁ এখন ঠেলা সামলাও।' কিন্তু রামবাবুরও একদিন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল যেদিন দেখলেন সাধের বাতাবীলেবুটা কে বা কারা নিয়ে গেছে। রামবাবু লাঠি নিয়ে দিকভ্রান্তের মত ছুটতে উদ্যত হলেন। সুরলক্ষ্মী বললেন — 'ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘুরিয়ে আর কি হবে ?' তারপর মধুর হেসে বললেন — 'ভেবে নাও না, ওটা তোমার নরনারায়ণের ভোগেই লেগেছে।'

নীরার সুনীল

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

তোমার ওষ্ঠপুটে চুম্বন এঁকেছে, শরীরে শরীর দিয়েছে, হৃদয়ে জ্যোৎস্নার মাধুরী দিয়েছে, স্তনবৃন্তে আনন্দের ক্ষীর আর মধু, স্মিতিতে প্রাণ ছড়াবার ডাক দিয়েছে, দুই চোখে নীলাঞ্জন ছায়া, কটিতটে নদীর লহরী এনেছে, সে। নীরা, তুমি তাই প্রেমের প্রতিমা এতো রমনীয়তম !

তোমার সর্বস্ব খুলে ভাঁটফুলে দু'চোখ রেখেছে, যুগল কলস ছুঁয়ে হৃদয়দানের সব শেষ কথাও নিয়েছে, রাতদিন ঘুমে ও নির্ঘুমে উন্মাদ দু'চোখের পাতায় তোমারই রক্তমাংসের মূর্তি এঁকেছে, শুক্লা দ্বাদশী ও কৃষ্ণা চতুর্দশীর চন্দ্রকলার জোয়ার-ভাটার সাথে নেচেছে মরেছে, সে। নীরা, তুমি তাই প্রেমিকার অধিক প্রেমিকা এতো গরবিনী। তোমার জন্যে রক্ত দিয়ে একশো-আট পদ্ম ফুটিয়েছে তোমার জন্যে নিজেও আগুন খেয়েছে আগুনও জ্বেলেছে তোমার মাংসের গভীরে, তোমার জন্যে লাজ মান জলাঞ্জলি দিয়ে কতোবার বিবস্ত্র হয়েছে, তোমাকে সুরভিত করার জন্যে চন্দনের বাটি হাতে একা নিঃস্ব দাঁড়িয়েছে, তোমার জন্যে জলে ভিজে রোদে পুড়ে অরণ্যের গহনেও হারিয়েছে, তোমার জন্যে নিজে অপ্রাকৃত সেজেও

তোমাকে পরমা প্রকৃতি করেছে, সে। নীরা, তুমি তাই ঐশ্বর্যময়ী এতো ভুবনমোহিনী !

তুমিও সর্বস্ব খুলে যা' দিয়েছ জ্যোৎস্নাদানের মতো অসামান্য তা'। তবু সে তোমার কেবল প্রেমিক না, তোমার স্রষ্টাও, পিতার মতোই। দিনান্তের প্রান্তে সে একাই পিতা ও প্রেমিক। নীরা, তাই এবার আর অন্য কিছু না, তার পায়ে একটি প্রণাম শুধু রাখো।

ঈশ্বর

শচীন দত্ত

সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরছে রঞ্জন। এলিট সিনেমা থেকে। তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। আকাশে মেঘ। বৃষ্টি আসতে পারে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে গিয়ে মনে হল প্রস্রাবের বেগ—তলপেটটা হাল্কা করা দরকার, তারপর মোড়ে গিয়ে বাস ধরা। কোথায় হাল্কা হবে ভাবতে ভাবতে নিউমার্কেটের দিকের রাস্তায় এসে পড়েছে। লোকজন প্রায় নেই পথে। ফুটপাতের একদিকটার অন্ধকার দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল। কে ওটা ? একটা লোক বসে আছে ফুটপাতে — বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। নিশ্চয়ই মাতাল—ওভারডোজ হয়ে গেছে — এখন নট্ নড়ন চড়ন অবস্থা। একটু হেসে তার পাশ কাটিয়ে, একটু দূরে গিয়ে, পাগলটাকে প্রায় উপেক্ষা করেই, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো রঞ্জন। জিপারটা খুলতে যাবে — হঠাৎ একটা কুকুর কোত্থেকে এসে তার পায়ের কাছে জিভ্ তুলে দাঁড়ানো। রঞ্জনের খুব রাগ হল — নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ সারবার যো নেই — প্রথমে একটা মাতাল — তারপর একটা সারমেয়। খুব রেগে গিয়ে জোর একটা লাথি কষাল কুকুরটার গায়ে। কেঁউ কেঁউ করতে করতে ডিগবাজী খেয়ে পড়ল রাস্তায় ঠিক একেবারে পাগলটার সামনে।

— "আরে কি করলে ভাই, কি করলে ? ও গড্ । তুমি ঈশ্বর কে লাথি মারলে — পাবও নাকি ? — পাগলটা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। রঞ্জনতো অবাক। চেয়ে দেখে পাগলটা তার বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকছে। রঞ্জন

হতভম্ব হয়ে ভুলে গেল সে কি করতে এখানে এসেছিল ? অবাক চোখে সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে—

— "ঈশ্বরকে লাথি মারলাম ? তুমি বলছ কি ?"

— "হ্যাঁ, ঈশ্বর বই কি ? গড্ গড়। কুকুর বানান জানো ? D – O – G → Dog. এবার এটাকে ওল্টাও দেখি ? কী হল ? G – O – D → God. হয়না ? গড্‌কে তুমি লাথি মারলে ? রঞ্জন ডো থ। পরক্ষণেই সে তীব্র হাসিতে ফেটে পড়ল — সঙ্গে সঙ্গে মাতালটাও। মাতালের নেশা তখন একদম ছুটে গেছে।

সম্পর্ক

শিপ্রা সেনধর

সারাজীবন যাকে দাদার মতো সম্মান করে এসেছে আজ তারই মুখ থেকে এমন কথা শুনে কিছুৎ খেলে যায় উর্মিলার মাথায়। একই সাথে তারা এতদিন ছবি এঁকেছে। তরুনদা চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠিত প্রবীন শিল্পী। মিসেস দত্ত-ও প্রতিভাময়ী। লোকে বলে উজ্জ্বল সম্ভাবনা তার মধ্যে। বিরস জীবনে সে-ও সে ভাবে না পরকীয়ার কথা, তা নয়। তবে পাল্লাপাথরে কাউকেও সে সমান মূল্যের করে ভাবতে পারে না। ফলে যারা ভিলিক দেয় তারা সকলেই বানচাল হয়ে যায়। তরুনদা নিজের সদ্য-বেরুনো ছবির বইখানা আজ মিসেস দত্তের হাতে দিয়ে বলে — সৌজন্য সংখ্যা, তোমাকেই সবার আগে দিলাম। কারণ তোমাকে কিন্তু আমি অন্যচোখে দেখি। এত ভালো লাগে না আর কাউকে। তুমি যদি এর মূল্য দাও উর্মিলা ...। জানো আমার বিশ্বাস — দাদা বা মিমি এসব সম্পর্ক মানা আদপেই ভুল একটা ব্যাপার। সত্য সম্পর্ক একটাই — পুরুষ এবং নারী। আর শোনো আমার কথাগুলো যেন তোমার আমার দুজনের মধ্যেই থাকে। কচের মতো ব্যবহার করা ঠিক হবে না। শত্রু বাড়ানোও ঠিক নয় ভেবে উর্মিলা হেসে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে — তাই, তাই ? আচ্ছা। হাসতে হাসতে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলেই যায় অন্যান্য দিনের মতো বলতে — আসবেন আবার।

সন্ধিকাল

সাত্যকি হালদার

অনেকদিন পর আবার ঘুমের মধ্যে আকাশের স্বপ্ন দেখল সে।

আকাশের স্বপ্ন সে আগেও দেখেছে। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, ধোঁয়াটে গুহা, কখনও এদিক ওদিক থেকে আচমকা বিদ্যুতের ঝলক। ঘুমের মধ্যেও চমকে উঠেছে তখন। কিন্তু এদিন দেখল একদম অন্যরকম আকাশ। এদিন দেখল নীল আর সবুজ আকাশের স্বপ্ন। শান্ত আর সাদা মেঘের ঢেউ তোলা। মেঘের মাঝখান চিরে বেরিয়ে গেছে হালকা সোনালি পথ। আকাশের সেই পথে সেদিনের স্বপ্নে সে একা।

পথ চলে গেছে দিগন্তের দিকে। সেই পথে শেষ বিকেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে। পথের ধারে নাম না জানা কতরকম গাছ, দু একটা ছোট টিলা, টিলার ঢালে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। পথে চলতে চলতে কখনও ঘাসেও হেঁটে আসছিল সে। ঘাসের বুকে মাথা তোলা প্রজাপতির মতো নানারকম ফুল। এসব ফুল সে গত বছর স্কুলের বাগানে দেখেছে। বারো ক্লাসের শেষ যেদিন স্কুলে যেতে হল সেদিন কয়েকজন মিলে বাগানে ঢুকেছিল ওরা। পঙ্কিস্যার ফুলে হাত দিতে বারণ করেছিলেন।

স্বপ্নের আকাশ-পথে চলতে চলতে হাওয়া উঠল একবার। সেই হাওয়া শান্ত এবং পরিষ্কার। এক কণাও ধুলো ছিল না তাতে। মেঘেরা কিছুক্ষণের জন্য এলোমেলো হয়ে গেল। এক টুকরো ছোট্ট মেঘ উড়ে এসে লাগল তার কপালে। মেঘের আঘাত যে এত চমৎকার হয় সেদিন সে স্বপ্নেই এটা জানল। মেঘের হাওয়ায় তার জামার পেছন দিকটা উড়তে থাকল পতপত করে। সে সামনের দুটো বোতাম খুলে দিল। মিষ্টি বাতাস ছুঁয়ে গেল সারা শরীর।

আকাশ ছাড়িয়ে পথ এসে পড়ল ঘন বনের মাঝে। অচেনা একটুও ভয় করল-না তার। এই বন যেন তার কতকালের চেনা। অনেক উঁচুতে মাথা-তোলা পাইন আর দেবদারুকে যেন অনেকবারই ছুঁয়ে দেখেছে হাত দিয়ে। বনের মধ্য

দিয়ে যে পথ সেই পথেও নির্দ্বিধায় হেঁটে চলল সে। গাছের মাথায় মাথায় ডাকাডাকি করছিল পাখিরা। দৌড়ে পালাচ্ছিল কাঠ বিড়ালির দল। এসব ভীষণ ভালো লাগছিল তার। মনে হচ্ছিল এই বনের মধ্যেও একটা জায়গা তার জন্য সাজানোগোছানো রয়েছে। কখন তার দেখা পাওয়া যাবে চলতে চলতে তাই সে ভাবছিল। আরও কিছুক্ষণ স্বপ্নের বনে হাঁটবার পর সত্যিই একটা ঘর দেখতে পেল সে। বনেরই একপাশে গাছপালায় ঘেরা, সামনে ছোট্ট পুকুর, একটাই মাত্র ঘর, তার আধ-খোলা দরজা। সেদিনের স্বপ্নে তার কোনও দ্বিধা নেই। তাছাড়া ঐ ঘরটার জন্যই হয়ত এতক্ষণের পুরো স্বপ্নটা সে দেখছিল। এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে সে ঘরের ভেতর তাকাল। আর তাকিয়েই কেমন অবাক। হালকা আলোয় ভরে ছিল সারা ঘর। মিষ্টি ধূপের গন্ধ উঠছিল। ঘরে একটিমাত্র তাকিয়া ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। সেই তাকিয়ায় কেউ একজন বসা, দরজার দিকে পিছু ফেরানো তার। আরও কিছুটা এগিয়ে গেল সে। এবার একটা চাপা অস্বস্তি শুরু হল। তাকিয়ায় যে বসা সে একজন মেয়ে ছাড়া আর কেউ নয়।

মেয়েটি এতক্ষণ দেখছিল না তাকে। অথচ সে দেখছিল মেয়েটির ফর্সা হাত, খোলা চুল, মেয়েটির মাখনের মতো পিঠ সম্পূর্ণ খোলা, কোথাও কাপড় নেই একটু। এবার তার নিশ্বাস ভারি হয়ে এল, এমন অবস্থায় কোনও মেয়েকে সে কোনও কালেই দেখেনি। পেছনে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল কে হতে পারে মেয়েটি। জুহি চাওলা ? কাজল ? নাকি কেলিস্টি — স্যারের ব্যাচে পড়তে আসা নিবেদিতা গার্লসের সেই মেয়েটি, যে ওর কাছে একদিন কলম চেয়েছিল !

হঠাৎ করে মেয়েটি এবার নড়ে উঠল একটু। আর তারপরই পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে-থাকা ওর দিকে তাকাল। ওর বুকের রক্ত ছুটোছুটি শুরু করেছে তখন কারণ মেয়েটির সামনের দিকেও কোনও আবরণ ছিল না। তার চাইতেও সে অবাক হল মেয়েটির মুখ দেখে। জুহি চাওলা নয়, নিবেদিতার মেয়েও নয়, তার সামনে যে বসে আছে সে স্বয়ং তার নিজের মামীমা।

তার অস্বস্তি আরও তীব্র হল এবার। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল মামীমার সামনে। কোনও কথাই মুখে এল না তার। অথচ মামীমার কোন সংকোচ ছিল না তখন। অপলক তিনি ওকে দেখছিলেন। আর হাসছিলেন একটু একটু। ওর অস্বস্তি দেখে হাসতে হাসতে এক সময় তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে কেন মৃন্ময়, এখানে বোস আমার পাশে। তারপর তার আর কিছু মনে নেই। সারা গা ঘেমে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙে দেখল লোডশেডিং, মাথার ওপর স্থির হয়ে আছে পাখাটা। বিছানাটাও ঘামে চপচপে হয়ে ছিল। দুঃস্বপ্ন সরিয়ে দেওয়ার মতো সে দুহাতে মশারি ঠেলে বাইরে বেরিয়ে জল খেল।

তারপর বহুবার মামীমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। মামীমার ব্যবহার ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। আন্তরিকতায় ভরা। আর তা হবে নাই বা কেন, মামীমা তো সেই রাতে ওরকম কোনও স্বপ্ন দেখতে পাননি।

কফিহাউস পত্রিকাকে
শারদ-শুভেচ্ছা সহ
আবদুল খালেক
প্রধান
দফরপুর গ্রাম
পঞ্চায়েত
রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ

অতি বিলম্বে পাওয়া কয়েকটি কবিতা

অমিত রায়

সৃষ্টি

আকার ভেঙে বেরিয়ে এলো মুখ
আর, নিরাকার বাতাসের বুকে উড়িয়ে দিলাম আমার অস্তিত্ব

গান

তর্পনে ভেসে উঠছেন লালনফকির . . .
চোখের জ্যোতিতে হিমাংশু দত্ত . . .
আমি গান শুনতে . . . শুনতে . . . ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছি।

তোমাকে

তোমাকে সর্বস্ব উজাড় ক'রে দেবো ব'লে
হাত বাড়িয়ে রেখেছি —
তুমি গ্রহণ করছো না।

তুমি পাথর, না-কি পাখি ।

নীরেন্দু হাজরা

পোষ্টকার্ড

তুরীয় আনন্দে বৃষ্টি যেরকম আসে, তুমি এলে
বৃষ্টি মেখে পোষ্টকার্ড। সোনার অক্ষরে যেন ঝর্না —
কলমের মুগ্ধ কথা। জীবন চলেছে — মৃত্যুভূমি
ছুঁয়ে, কী বিস্ময়ে। ললাট-মলাটে সিক্ত পর্না—
উড়ে যায়। আমি দেখি সত্তর-বালক একা একা
বেল-যুঁই কামিনীকে ছুঁড়ে দিচ্ছে বেনো জলে।
রৌদ্র ঝড় প্লাবন পিছনে পড়ে থাকে। এত ক্ষুদ্র
সময়ের ধরে রাখা কালি আর কবিতায়, সখা।

(অণু কবিতা হয়নি। এটি একটি খণ্ড লিরিক।
সম্পাদক : কফি হাউস)

নুরুল আমিন বিশ্বাস

বয়ঃ সন্ধির কবিতা

এক
সূর্যাস্তের ভয়ে যে বালিকার কণ্ঠরোধ
জানে সাপের ছোবলে সে নারী হবে।

দুই

সে তো শিরাধমনীর জলসুখ
নাকি প্রজাপতি বিবর্তন ।

তিন

নাভিজলে নেমেছে দিন
পুতুলের চরিত্র নষ্ট ।

চার

কালনাগিনী জেনেছে এবার
চিত্রগ্রহণের কলা কৌশল ।

রমাপ্রসাদ মিত্র

কবিতা

ভিতর দরজাগুলি বন্ধ করে সদরে দাঁড়াই
হাওয়ায় আলাপ ভাসে, তার দিকে বাঁহাত বাড়াই —
এ-ভাবে জীবনভর ভিন্ন ভিন্ন নিজেকে হারাই।
তারপর একদিন ভিতর দরজাখুলে দেখি শুধু ছাই শুধু ছাই শুধু ছাই

শুচিস্মিতা মজুমদার

অণু কবিতা গুচ্ছ

এক
ভালবাসা শিল্প এক
কবিতায় ছবি তার আঁকা
আরও গূঢ় শিল্প সে যে
আজীবন তাকে ধরে রাখা।

দুই

এই কি তবে মাঝ-তিরিশে চুল পাকতেই শেষের শুরু
দাঁত পড়তে বেয়াল্লিশে বুকের মধ্যে দুরু দুরু
কাম্রাটাকে যায়না রোখা হাস্য দিয়ে যতই ঢাকি
কোথায় ছিলাম ! কোথায় যাব ! যা' ছিল আর সবই ফাঁকি ?

সুশান্ত রায়

দুটি অণু কবিতা

এক

তোমার মৌন থাকা নিয়ে অনেককিছুই ভাবা যায়
কিন্তু তোমার চোখেই তো আসল কথাটি পড়ে নিই

দুই

অন্ধকার তোমাকে অনেক সময় দেয়
তবু তোমার ইচ্ছে কেন আলোয় কাঁদবার

চারুকলা প্রদর্শনী

কৃতি চারুকলা শিল্পী শ্রীমতী সুজাতা বিশ্বাসের হস্তশিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনীর বিশাল আয়োজন কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রের প্রদর্শনী মঞ্চে আয়োজিত হচ্ছে পুজোর পরে সহযোগিতা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, চারুকলা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

একটি বিতর্কিত কবিতা

লিট্‌ল ম্যাগাজিন

সিদ্ধার্থ সিংহ

লিট্‌ল ম্যাগাজিন করা বন্ধ করে দিন।

এক টেবিলে বসে যে সব বন্ধুর সঙ্গে রোজ আড্ডা মারেন তাদের মধ্যে থেকে কেউ উঠে গিয়ে একটু অন্য টেবিলে বসলে তাকে নিয়ে কানাঘুষো শুরু করে দেন,

এ আপনার অনেক দিনের চমৎকার স্বভাব।

কারও নাম লেটার প্রেস থেকে অফসেটের ঝকঝকে রঙিন পাতায় চলে যেতে দেখলে

বলে ওঠেন বাহ্যবাহ্য।

ঠিকই তো —

আট পাতার কাগজ বের করলে

চার পাতায় জুড়ে রাখেন নিজের কবিতার ওপর আলোচনা, যে বই কখনও কোনও দিনও বেরুবে কি না সন্দেহ যত্নস্থ বলে পাতায়-পাতায় বোল্ডে ছাপেন তার বিজ্ঞাপন, আট পাতার কাগজে অন্তত আঠাশবার আপনার নাম নক্ষত্রের মতো ঝিকমিক করে।

লিট্‌ল ম্যাগাজিন করা বন্ধ করে দিন।

লিট্‌ল ম্যাগাজিন করতে করতে আপনি ভীষণ লিট্‌ল হয়ে যাচ্ছেন।

এই কবিতাটির মিঠেকড়া সমালোচনা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পাঠকরা দেখতে পাবেন।

সম্পাদক : কফি হাউস

কথাবার্তা ঃ প্রসঙ্গ হৃদ্‌রোগ

ডাঃ এস. চ্যাটার্জী M.B.B.S. Dipcard M.D. (Cal)
বনাম ঃ অশোক রায়চৌধুরী

প্রশ্ন ঃ

১। হৃদরোগ-এর সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে হলে নিয়মিত হাঁটাচলা, ব্যায়াম বা নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস প্রয়োজন, এই কথাটা কি আপনি সমর্থন করেন ?

ধূমপান ও মদ্যপানের সঙ্গে হৃদরোগের কতটুকু সম্পর্ক ?

নিরামিষাশী ও আমিষাশী এদের মধ্যে কাদের হৃদরোগের সম্ভাবনা বেশী ?

টেনশন মানসিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কি হৃদরোগ ডেকে আনতে পারে ?

ট্র্যাঙ্কুলাইজার, অ্যান্জিয়োলাইটিক ড্রাগ কি দীর্ঘকাল খাওয়া ক্ষতিকর ?

হার্টব্লক ব্যাপারটা কি ? কমপ্লিট ও পারশিয়াল হার্টব্লক কি ? R.B.B.B. L.B.B. A.V.B. কি এদের মধ্যে কোনটা বেশি মারাত্মক ?

হার্টব্লকে ব্যায়ামের ভূমিকা কি ?

হার্টব্লকের রোগীদের কি কি সতর্কতা গ্রহণ করা উচিৎ ?

উত্তর ঃ

১। সুস্থ লোকেদের এই নিয়মগুলি পালন করতে হবে যাতে শরীর স্বাস্থ্যকর ও সবল থাকে। তবে এর দ্বারা হৃদরোগ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে না, কারণ উচ্চ রক্ত চাপ, বহুমূত্র রোগ, ধূমপান করা বা নিকট আত্মীয়দের হৃদরোগ থাকলে করোনারী হৃদরোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

ধূমপান করলে Coronary artery disease (করোনারী-হৃদরোগ), মস্তিষ্কে স্ট্রোক ও Peripherial vascular disease (বহির্ভাগ রক্ত বহনালীর রোগ) হয়। এছাড়া ফুসফুসে ও মূত্রথলির

Cancer (কর্কট রোগ) দেখা যায়। দিনে প্রতি দশটি সিগারেট পান করলে পুরুষদের ১৮% ও মহিলাদের ৩১% হৃদরোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ধূমপান বন্ধ করলে যারা এক প্যাকেট করে ধূমপান করতেন তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা ৪০% কমে যায়। অত্যধিক মদ্যপান করলে রক্তচাপ বেড়ে যায় ও হৃৎপিণ্ড ফুলে ওঠে ও দুর্বল হয়ে যায় — সুরাসার ঘটিত হৃৎপেশীয় রোগ (ALCOHOLIC CARDIOMIOPATHY)। তবে দিনে এক দুই পেগ করে মদ্যপান করলে করোনারী হৃদরোগ বাড়ে না।

করোনারী হৃদরোগ আমাদের দেশে বেড়ে চলছে। নিরামিষাশী ও আমিষাশী দুই শ্রেণীর মানুষের হৃদরোগ হচ্ছে। খাবারে Saturated Fat (চর্বির) পরিমানের ওপর নির্ভর করছে রক্তের Cholesterol-এর মাত্রা। এটা বেশি থাকলে করোনারী হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ে।

টেনশন, মানসিক উদ্বেগ উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা হৃদরোগ ডেকে আনতে পারে। রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় ও হার্ট অ্যাটাকের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। করোনারীর রোগীদের বুকে ব্যথা বাড়তে পারে। রোগী হঠাৎ মারা যেতে পারেন।

এক থেকে দুই সপ্তাহের বেশি এই জাতীয় ঔষধ খাওয়া উচিৎ নয়। অনেকদিন ধরে খেলে শারীরিক বা মানসিক আসক্তি হয় এবং ঔষধ বন্ধ করলে অনিদ্রা ও শারীরিক অস্বস্তি হয়।

হৃদযন্ত্রের সংকোচনের জন্য হৃদস্পন্দন প্রয়োজন, যা এস্-এ নোডে (SA NODE) তৈরী হয়। তারপর AV NODE (এ. ভি নোড), (Bundle of HIS) (বাণ্ডল্ অফ হিস্) হয়ে ডান ও বাম Bundle Branch (বাণ্ডল ব্রাঞ্চ) দিয়ে

হৃদস্পন্দন প্রবাহ দুই ভেন্ট্রিকেলে পৌঁছায় ও হৃদপিণ্ডকে সংকোচন করার নির্দেশ দেয়। এই হৃদস্পন্দন প্রবাহ যদি SA NODE থেকে ভেন্ট্রিকেলে দেরি করে পৌঁছায় বা পৌঁছাতে না পারে তাকে হার্টব্লক (Heart Block) বলে।

RBBB : Right Bundle Branch Block হলে, এই বান্ডল দিয়ে স্পন্দন প্রবাহ ভেন্ট্রিকেলে পৌঁছায় না। অনেক সুস্থ লোকের RBBB থাকে।

LBBB Left Bundle Branch Block বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হৃদরোগ থাকলে পাওয়া যায়। AV BLOCK হলে এট্রিয়াম থেকে স্পন্দন প্রবাহ ভেন্ট্রিকেলে পৌঁছায় না। এটা তিন প্রকার — 1° AV block—এখানে স্পন্দন প্রবাহ দেরিতে যায়। 2° AV block—এখানে মাঝে মাঝে এই প্রবাহ আটকে যায়। 3° AV Block—এখানে এট্রিয়াম থেকে কোন প্রবাহ ভেন্ট্রিকেলে পৌঁছায় না। এটা সব থেকে মারাত্মক। পেস্‌মেকারের প্রয়োজন হয়।

বয়স হলে SA NODE. AV NODE এবং RB Branch/LB Branch এ ফাইব্রাস্ টিসুর গঠন হয়। এর সঠিক কারণ জানা নেই। করোনারী হৃদরোগীদের হার্টব্লক হতে পারে। অত্যধিক সরষের তেল খেলে হার্টব্লক হতে পারে।

হার্টব্লক রোগীদের পেস্‌মেকার বসানো থাকলে কড়া Magnetic (চুম্বকত্ব) বা Electric (বৈদ্যুতিক) পরিবেশ রোগীদের এড়িয়ে যেতে হবে। যেমন বৈদ্যুতিক মোটর, ও সেলুলার ফোন। যারা পেসমেকার বসাতে পারেন নি তাদের সাবধানে থাকতে হবে। সাঁতার কাটা, ধারালো যন্ত্রের কাছে কাজকরা বা মই দিয়ে ওঠা উচিৎ হবে না, কারণ অজ্ঞান হলে দৈহিক ক্ষতি হতে পারে।

মিলন এন্টারপ্রাইস

৬এ, কালাচাঁদ সান্যাল লেন
কলিকাতা — ৭০০ ০০৪

সমস্ত রকম আধুনিক ও ঝকঝকে অফসেট প্রিন্টিং/সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং/বুক বাইন্ডিং/ডিটিপি এবং ইলেকট্রনিক প্রিন্টিং এর কাজ করানো হয়। যত্ন সহকারে ও যুক্তি গ্রাহ্যমূল্যে।

যোগাযোগ ঃ গৌতম সরকার

তরুন ও কৃতী কবি এবং ছড়াকার প্রতাপ সিংহের ব্যতিক্রমী কবিতার ও ছড়ার বই

১। কোথায় কার কী পড়ে আছে কে জানে !
২। যদি ঘুরে যায় নদী ঘুরে যায়

প্রকাশনা ঃ
থার্ড ওয়ার্ল্ড পাবলিকেশন (ঢাকা)
পাঠক লক্ষ্য রাখুন বইমেলা ২০০১-এ প্রকাশ হতে চলেছে।

এ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাগুলির উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

অভ্রান্ত মিশ্র ও উগ্র সেন

১৪০৭ শারদীয়া সংখ্যার 'কফি হাউস'—এ প্রকাশিত লেখাগুলোর উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য আমাদের দুজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন কফিহাউস-এর সম্পাদক। তাই সেই দায়িত্ব পালনের আগে একটা কথা বলে নিতে চাই যে, আমরা অকারণে চাইনা কাউকে আঘাত করতে, কাউকে কখনোই পিগমি বা ইগলু এবং কাউকে অহেতুক ডাইনোসরাস বা ব্রন্টোসরাস বানাতে। কেবলমাত্র আমাদের ভালোলাগা লেখাগুলোর ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করব। অন্যগুলো সম্পর্কে নীরব থাকব। পাঠকগণ যদি সেগুলোর উপর সমালোচনা বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পাঠান হয়ত সম্পাদক সেগুলো পরবর্তী সংখ্যায় ছাপতেও পারেন (অবশ্যই মননশীল বিবেচিত হলে)। আবার ফেলেও দিতে পারেন। অতএব শুরু করা যাক :

এই সংখ্যার নতুনতর প্রতিভা শ্রীমান স্মরণজিৎ চক্রবর্তী একজন সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ, তার কবিতার আণবিকতা, গঠন বিন্যাস এবং সামুহিকতা চমকে দিয়েছে আমাদের। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই বাংলার কবিতার সাম্রাজ্য তাকে রাজদণ্ড হাতে শাসন করতে দেখলে আমরা অবাক হব না। সেই প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্যে আছে। কি ছন্দে কি গদ্যে সর্বত্রই তিনি অনায়াস।

কবি গণেশ ভট্টাচার্য সম্পর্কেও ওই একই কথা বলতে হয়। তবে গণেশকে পরামর্শ, লেখা ছাপানোর জন্য ইতিউতি ঘোরাঘুরি না ক'রে নির্জনতম প্রাতিভাসিক কোণে বসে আত্মময় হয়ে লেখাটা চালিয়ে যাওয়াই তার কর্তব্য। লেখা ছাপানোর চাইতে ভালো লেখাটা অত্যন্ত জরুরি। এবং গণেশ ভালো লেখেও।

কবি ঈপ্সিতা ভাদুড়ি ও আসামের কবি ছবি গুপ্তা তাদের কবিতায় অনবদ্য মেধা ও নিষ্ঠার ছাপ রেখেছেন। বিদগ্ধ ও কৃতী এই দুই কবিকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। তবে ছবি গুপ্তার কবিতাগুলো বহু-লিরিক প্রকৃত অণু-কবিতা নয়।

মন্দাক্রান্তা সেন এই বাংলার একজন স্বীকৃত কবি। মিডিয়ার আলোয় তিনি আলোকিত। প্রতিভা নিয়েই তিনি জন্মেছেন — এই কবিতা গুলোতেও তার প্রতিভার কিছু বিস্ফুরণ চোখে পড়ে বইকি।

নতুন ও তরুণী কবি অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় আলোকবৃত্তের উজ্জ্বল রোশনাই থেকে অনেক দূরে পল্লী-বাংলার নিভৃতে বসে কবিতা লেখেন, তাদের কবিতাও সম্ভাবনাময় ও উজ্জ্বল। অণুগল্পে সবাইকে চমকে দেকেন — পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামবাসী বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর গল্পে আণবিকতা, তীব্র-তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বক্রোক্তি তদুপরি সাহিত্যের মাফিয়া বা প্রনোটার-রাজ—এর প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অনাস্থা ধ্বনিত হয়েছে — সাবাস বিপ্লব, তোমাকে টুপি খুলে সম্মান জানাচ্ছি।

এছাড়া নিভা দে ও নিয়তি রায়চৌধুরীর গল্প দুটি চমৎকার ও পরিণত। অল্প পরিসরে, অণুভাষিতায় যে এত বড়ো গল্প লেখা যায় তা ওই বাংলার অনেক প্রধান ও অপ্রধান গল্প লেখকের কাছে দিবালোক।

তবে নিভা দে'র গল্পে একটু বেশি ফেমিনিটি। তুলনায় নিয়তি রায়চৌধুরী অনেক বেশি পরিণত ও আধুনিক।

অণু-নিবন্ধে তরুণী নিবন্ধকার শ্রীমতী নন্দিনী বসু অসাধারণ ও অনন্য। সম্প্রতি উৎসারিত নারীবাদ ও তার প্রবক্তাদের প্রতি তীব্র ধিক্কার ও অনাস্থা ধ্বনিত হয়েছে তাঁর নিবন্ধে। সমস্ত আন্দোলন ও বিশ্বাসের উপরে যে ভালোবাসা নামক বস্তুটি আসীন তা এই সব হুজুগে ও হুল্লনারীবাদীদের তিনি অসাধারণ লেখনশৈলির মধ্যে দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ছড়াকারদের মধ্যে সর্বোত্তম ছড়া উপহার দিয়েছেন — ছড়াশিল্পী শ্রী শৈলেন কুমার দত্ত, পবিত্র অধিকারী ও জগৎ লাহা। এবং অবশ্যই এই বাংলার লুইস ক্যারোল বা এডওয়ার্ড লিওর-নামে অভিহিত হবার যোগ্য প্রবীণ ছড়াকার শ্রীউমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তাঁর ছোট্ট বিন্দু-আকারে হাইকু-প্রতিম ছড়াটি আমাদের কফি হাউস-এর এই সংখ্যার সম্পদ।

পবিত্র অধিকারীর ছড়াগুলো serious ও বৈদগ্ধ্যময়।

মতি মুখোপাধ্যায়ের ছড়াটি সেন্সুয়াস, মাঝে মাঝে অধম অন্ত্যমিলে কেঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সংশোধন করা হল।

এছাড়া মল্লিকা সেনগুপ্তের ছড়াটি বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ এনেছে। একেই বলে Maximum effect with minimum materials. সুবোধ সরকার-এর কবিতাটি ছড়াক্রান্ত তাই এটির নাম হোক ছড়িতা। কবিতাটিতে প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ ও ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে এমন একজন কণ্ঠশিল্পীর বিরুদ্ধে যার নাম বলে দেবার দরকার নেই। একেই বলে Social Commitment. অতি বিলম্বে পাওয়া কবিতার মধ্যে নুরুল আমিন বিশ্বাস প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি একজন মেধাবী কবি। কবিতা ভাদুড়ির কবিতায় বানানভুল বড্ড বেশি দৃষ্টিকটু। তিনি সাপ (Snake) বানান 'শাপ' লিখেছিলেন। উন্মাদনা লিখতে গিয়ে 'উন্মানা' লিখেছেন সম্ভবত। সেইভাবেই রাখা হল।

ছড়াতে সর্বকনিষ্ঠা ও কিশোরী ছড়াকার অর্পিতা রায়চৌধুরীর ছড়ার হাতটি পাঠক লক্ষ্য করুন।

অশোক মুখোপাধ্যায়ের ২নং ছড়াটি 'বন সৃজন' — ভ্রান্তিপূর্ণ হ্রস্ব-মাত্রা মিলে বিস্বাদু। অনিন্দ্য দেব সুন্দর ছড়া লিখেছেন।

অণু-নিবন্ধে কাশীনাথ ভকত-এর নাম উল্লেখ করা উচিত। ছোট্ট পরিসরে অনেক বড়ো ক্যানভাসকে ধরেছেন তিনি।

অঞ্জলি চক্রবর্তীর গল্পটি অণুগল্প হয় নি। ওটা স্কেচ হয়ে গেছে। অণুকবিতাও বলা যায়। সুন্দর ও মরমী।

সিদ্ধার্থ সিংহের 'লিটল ম্যাগাজিন' কবিতাটি স্পষ্টবাদী এবং সর্বাধুনিক। কিন্তু তার মধ্যে একটি বিরাট 'তবে' ও 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে প্রাতিষ্ঠানিক পত্র-পত্রিকার চাকর-বাকর, খিদমদগার, প্রুফ রিডার, মেশিনম্যান, মায় বাড়ুদার পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনুকম্পায়, করুণায় ও আনুকূল্যে দু-চারটি লেখা ছাপানোর সুযোগ পেয়েই নিজেদের রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা ভাবতে শুরু করেন। এই কারণেই লিটল ম্যাগাজিনের প্রতিভাবান মেধাবী অথচ উপেক্ষিত, অনাদৃত ও ছায়াবৃত লেখকেরা তাদের কাছ থেকে একশো মাইল দূরে অবস্থান করেন— রাগে দুঃখে ক্ষোভে ও অভিমানে।

অতিবিলম্বে পাওয়া কবিতার মধ্যে প্রবীণ ও বিদগ্ধ কবি উত্তম দাশের প্রতিটি কবিতাই সার্থক ও উচ্চাঙ্গের অণুকবিতা বলতে আমার দ্বিধা নেই। কথার মোচড়ে কথা, ঘূর্ণাবর্ত, তীক্ষ্ণশ্লেষ ও বক্রোক্তি এই কবিতাগুলোকে রসালো ও বৈদগ্ধ্যময় করে তুলেছে। একেই বলে ফেনোপিয়া বা লোগোপিয়া এবং উইট। অগ্রজ ও অগ্রণী কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতাগুলো সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলতে হয়। তাঁর কবিতায় কথনশিল্প ও উইট দেখার মতো। বীথি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। একপংক্তির কবিতায় কাজল চক্রবর্তী ও মঞ্জুষ দাশগুপ্ত খানিকটা ভ্যারাইটি আনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হতে পারেন নি। অগ্রজ ও অগ্রণী আরেক কবি অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর প্রথম কবিতাটি বেশ সুলিখিত হলেও দ্বিতীয়টি যোগাস বা ঝুপড়ি। একদা 'প্রসন্ন অর্জুন'-এর হাত থেকে এমন গাণ্ডীব খসে পড়ছে কেন?

অব্রাত্ত মিশ্রের 'ছায়াসঙ্গিনী' ও কৃষ্ণা বসুর 'চোরা কুঠুরীর আঁধার' গল্প সম্পর্কে কিছু বললাম না। কারণ এরা কফি হাউসের সঙ্গে জড়িত।

বাদবাকি লেখাগুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারছি না। এজন্য দুঃখিত। এই সংখ্যায় বেশ কিছু নিম্ন মানের অপরিণত ও বালখিল্য ভুলভাল বানান ও অসংলগ্ন রচনা কফিহাউসের মান ও সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। আগামী সংখ্যায় কফিহাউস কঠোরতর নির্বাচন নীতি অনুসরণ করবে। লেখকরা লেখিকারা সাবধান।

অনুবাদ-অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

উপনিবিষ্ট দুই কারা (ওড়িয়া)
ফকীর মোহন সেনাপতি
অনুবাদ : মৈত্রী গুপ্ত ১৩ টাকা

কাক ও কালাপানি
(হিন্দি গল্প)
নির্মল বর্মা
অনুবাদ :
মায়া গুপ্ত ৪০ টাকা

রক্তবেনা (তামিল)
ইন্দিরাপার্থসারথী
অনুবাদ : সুপ্রসন্নিধন কৃষ্ণমূর্তি ৪০ টাকা

সর্প ও রজ্জু (ইংরেজি)
রাজা রাও
অনুবাদ :
রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৫ টাকা

ঝিলমিল নদীর ধারা
(পাঞ্জাবী আত্মজীবনী)
অজীত কৌর
অনুবাদ : জয়া মিত্র
৬০ টাকা

সাহিত্য অকাদেমি

জীবনতারা, ১৩এ/৪৪ একদ, ডায়মণ্ড হারবার রোড
কলকাতা — ৭০০ ০২৩, দূরভাষ : ৪৭৮১৮০৬
প্রাপ্তিস্থান।। অকাদেমি দপ্তর, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স
উষা পাবলিশিং ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি

যারা কাজ করে . . .

যাদের জন্য পাখার হাওয়া
যাদের জন্য বাতি
যাদের জন্য উনুনসিঁড়ি
শহর গ্রামে যারা
তাদের শ্রমের ফসল ফলে
যাদের কৃষি ক্ষেতে
তাদের জন্য পূজোয় সবাই
উঠবে আলোয়
পূজায় যখন ঝলমলে রাত
উৎসবে ভরপুর
তাদের কাটে বিরাম বিহীন
রাত্রি ও দুপুর

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

বিখ্যাত উর্দু শায়েরীকারদের উর্দু শায়েরীর বাংলা কাব্যানুবাদ
অশোক রায়চৌধুরীর

কথনো শায়েরী

আপনারা কি পড়েছেন ? কিনেছেন ? দেখেছেন
একবার বইটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন
প্রকাশনা।। কফিহাউস
মূল্য : দশ টাকা

Space donated by

A

Well Wisher

থার্ডওয়ার্ল্ড পাবলিকেশনের প্রথম উদ্যোগ

❐ প্রেমের কবিতা
কবিতার প্রেম ❐

কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত ও অশোক রায়চৌধুরীর
যুগ্ম কাব্যগ্রন্থ, ঢাকা ও কলকাতা থেকে একযোগে
ডিসেম্বর, ২০০০-এ বেরোচ্ছে

অশোক রায়চৌধুরী ও কৃষ্ণা বসুর যুগ্ম কাব্যগ্রন্থ

❐ ছন্দের ডানা মেলে
❐ প্রেম নেই, প্রেম আছে

মঞ্জুশ দাশগুপ্ত ও অশোক রায়চৌধুরী

❐ কবিতা যখন আবৃত্তির

পাঠক সমাজের নজর কেড়েছে ইতিমধ্যেই
কবি অরুণেন্দু চক্রবর্তী ও অশোক রায়চৌধুরীর যুগ্ম কাব্যগ্রন্থ

❐ যাঁরা কবিতা পড়েন না

বইমেলা ২০০১-এ বেরোচ্ছে

শিল্পকলাশিল্পী সুজাতা বিশ্বাসের বিগত-সম্প্রতি প্রকাশিত

দুটি ছন্দাশ্রয়ী ও ছন্দাশ্রয়ী কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করুন

নরকের আলো (মূল্য — ৩৫ টাকা)

মরুদ্যানে পদ্মগন্ধ (মূল্য — ২৫ টাকা)

পাঠক মহলে উচ্চপ্রশংসিত

[illegible] নিম্নবর্তী গ্রন্থাগারে ৩০% discount-এ কিনুন।

সুজাতা বিশ্বাসের

আণবিক প্রেমের কবিতা

শীঘ্রই বেরোচ্ছে।

প্রাপ্তিস্থান :—

[illegible] ব্রাদার্স

[illegible]র্জী এবং কফিহাউস দপ্তর

[illegible]ন, কলি-২ থেকে সম্পাদিত ও মিলন এন্টারপ্রাইজ, [illegible] থেকে অরীশ রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।